আট আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ষট্‌ত্রিংশ গ্রন্থ

হরিশ ভাণ্ডারী

শ্রীজলধর সেন

বৈশাখ, ১৩২৮

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
কালিকা প্রেস,
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

পরলোকগত সাহিত্যরথী, পূজনীয়

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুর

সি-আই-ই মহোদয়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১।	প্রবাসচিত্র (তৃতীয় সংস্করণ)	...	...	১৲
২।	পথিক (তৃতীয় সংস্করণ)	...	...	১৲
৩।	নৈবেদ্য (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	...	॥০
৪।	কাঙ্গাল হরিনাথ (প্রথম খণ্ড)	...	...	১।০
৫।	কাঙ্গাল হরিনাথ (দ্বিতীয় খণ্ড)	...	...	১।০
৬।	করিম সেখ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	...	৸০
৭।	ছোট কাকী (তৃতীয় সংস্করণ)	...	...	৸০
৮।	নূতন গিন্নী (তৃতীয় সংস্করণ)	...	...	৸০
৯।	বিশুদাদা (তৃতীয় সংস্করণ)	...	...	১।০
১০।	পুরাতন পঞ্জিকা	...	...	১৲
১১।	হিমালয় (সপ্তম সংস্করণ)	...	...	১।০
১২।	সীতাদেবী (তৃতীয় সংস্করণ)	...	...	১৲
১৩।	আমার বর (তৃতীয় সংস্করণ)	...	...	১।০
১৪।	পরাণ মণ্ডল (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	...	১।০
১৫।	হিমাদ্রি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	...	৸০
১৬।	কিশোর (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	...	১৲
১৭।	অভাগী (ষষ্ঠ সংস্করণ)	...	...	॥০
১৮।	আশীর্ব্বাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	...	১।০
১৯।	দশদিন	...	...	১।০
২০।	দুঃখিনী (তৃতীয় সংস্করণ)	...	...	॥৵০
২১।	এক পেয়ালা চা	...	...	১॥০
২২।	বড়বাড়ী (চতুর্থ সংস্করণ)	...	...	॥০
২৩।	পাগল	...	...	১॥০
২৪।	হরিশ ভাণ্ডারী (তৃতীয় সংস্করণ)	...	...	॥০
২৫।	ঈশানী	...	...	১॥০
২৬।	কাঙ্গালের ঠাকুর (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	...	॥০
২৭।	ষোল-আনি	...	...	১॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হরিশ ভাণ্ডারী

[১]

সে অনেক দিন পূর্ব্বের কথা—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ। পরেশ সেই বৎসর গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহার পিতার নিকট কলেজে পড়িবার কথা বলিলে তিনি বলিলেন, সে সাধ্য তাঁহার নাই। তাহার মা বাঁচিয়া থাকিলে, পিতার যে আয় ছিল, তাহাতেই তাহার কলেজের ব্যয় চালাইবার সাধ্য তাঁহার হইত; কিন্তু তিন বৎসর পূর্ব্বে পরেশকে একেলা ফেলিয়া তাহার মাতা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিলেন। ঘরে বিমাতা; তাই তাহার পিতার সাধ্য হইল না। বিমাতা তাহার প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন "অবস্থা দেখে ত কথা বল্‌তে হয়। ইচ্ছে ত সবই করে, কুলোলে ত হয়। গরিবের ছেলে, একটা পাশ হয়েছ, সেই ই ঢের; এখন একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখ। গলায় একটা মেয়ে, তা কি দেখ্‌ছ না?" বিমাতার মেয়েটি কিন্তু গলায় নহে—কোলে,—খুকীর বয়স তখন সবে সাত মাস।

পরেশ বুঝিল, বাড়ী হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে না। তবে কি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া এই পনর বৎসর বয়সেই চাকরীর চেষ্টা করিতে হইবে? তাহার মন বলিল, সে চেষ্টার পূর্ব্বে একবার পড়াশুনার চেষ্টা করিলে হয় না?

পরেশদের গ্রামে এক-ঘর—সবে এক-ঘর মাত্র বড়মানুষ, আর সকলেই তাহাদের মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—বলিতে গেলে দিন আনে দিন খায়। গ্রামের যিনি বড়মানুষ, তাঁহার নাম লক্ষ্মীকান্ত পরামাণিক ; জাতিতে তন্তুবায়, ব্যবসায়ে পাটের মহাজন। দেশে প্রকাণ্ড কারবার ; সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও কলিকাতায় প্রকাণ্ড আড়ত ;—অনেক টাকা ব্যবসায়ে খাটে। কর্ত্তা লক্ষ্মী পরামাণিক দুই ছেলের উপর বিষয়-কর্ম্মের ভার দিয়া এখন কাশীবাসী হইয়াছেন ; বড়বাবু বংশীধর ও ছোট বাবু সৃষ্টিধর এখন সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখেন। ছোটবাবু বাড়ীতেই থাকেন ; বড়বাবু দরকার-মত সিরাজগঞ্জে যান, কলিকাতায় যান, বাড়ীতেও থাকেন। বড়বাবুই এখন প্রকৃতপক্ষে এই বিস্তীর্ণ কারবারের কর্ত্তা।

পিতার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া পরেশ মনে করিল একবার ছোটবাবুর কাছে গেলে হয় না। তাঁহাদের কলিকাতার আড়তে কত লোক থাকে, তাহাদের মধ্যে কি আর তাহার একটু স্থান হইবে না ?

একদিন প্রাতঃকালে পরেশ ছোটবাবুর নিকট গেল। তাহার পাশের সংবাদ তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়াই সহাস্যমুখে বলিলেন "আরে এস পরেশ, তুমি পাশ হয়েছ শুনে বড় খুসী হয়েছি। তারপরে পড়াশুনার কি ব্যবস্থা হলো।"

পরেশ বলিল "সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি।" এই বলিয়া তাহার বাবা ও মা যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্ত কথাই তাঁহাকে বলিল। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন "তোমার

এই ছেলে বয়স, আর তুমি এমন ভাল ছেলে ; এখনই কি পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া ভাল হবে।"

পরেশ তখন সাহস পাইয়া বলিল "আপনি যদি দয়া করেন, তা'হলেই আমার কলেজে পড়া হয়।"

ছোটবাবু বলিলেন, "তা ত বটে। আমাদের কল্‌কাতার আড়তে কত লোক রয়েছে,—তার মধ্যে তোমার দুটো খাওয়া অনায়াসেই চলে যেতে পারে। কিন্তু কথাটা কি জান, দাদা বাড়ীতে নেই ; তিনি কাশীতে বাবার কাছে গিয়েছেন ; আর এ বছর আমাদের কাজের অবস্থাও তেমন সুবিধে মত নয়। দাদার মত না নিয়ে ত আমি একটা কাজ করে বস্‌তে পারিনে, কি বল ? তা' তিনি ত আর মাস-দুয়েক পরেই বাড়ী আস্‌ছেন; তখন তাঁকে বলে-ক'য়ে যা হয় একটা করা যাবে, কি বল ?"

পরেশ বলিল "তা হলে বড় দেরী হয়ে যাবে, হয় ত তখন কলেজে ভর্ত্তিই করবে না। একটা বছরই যাবে।"

ছোটবাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "তা দেখ, তুমি কল্‌কাতায় গিয়ে আমাদের আড়তে থেকেই কলেজে পড়া আরম্ভ করে দেও। দাদা ফিরে এলে আমি বলব ; তিনি এতে অবশ্যই অমত করবেন না। কিন্তু কথাটা কি জান, দুবেলা দুটো খাওয়ার না হয় ব্যবস্থা হোলো, কিন্তু কলেজের মাইনে চাই, বই-টই চাই, হাতখরচও দু'চার টাকা চাই। তার কি উপায় হবে ? তোমার বাবার কাছ থেকে যে কিছু পাবে, সে ভরসা নাই, কি বল ?"

পরেশ বলিল "কোন ভরসাই নাই। আপনি যা বল্‌বেন, যা করবেন, তাই হবে।"

ছোটবাবু বলিলেন "যাক্ সে জন্য চিন্তা নাই; কল্‌কাতায় গিয়ে একটা ছেলে পড়ালেও আট-দশ টাকা হয়ে যাবে, কি বল?"

[২]

পরেশ ছোটবাবুর চিঠি লইয়া সত্বর কলিকাতায় লক্ষ্মী পরামাণিকের আড়তে উঠিল। প্রধান কর্ম্মচারী অর্থাৎ গদি-য়ান রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী লোকটা বড়ই ক্রূর প্রকৃতির। তিনি কাহারও ভাল দেখিতে পারেন না। তিনি পরেশকে বড় ভাল চক্ষে দেখিলেন না; সে যেন একটা জঞ্জাল আসিয়া জুটিল, এই তাঁহার ভাব। তিনি প্রথম দিনই বলিলেন "তাই ত হে ছোকরা, আমাদের এ আড়ত; এখানে তোমাকে নটার সময় কলেজের ভাত দেবে কে? আমরা সেই বেলা একটা-দেড়টায় খাই। ছোটবাবুরও হিসেব-নিকেশ নেই; পাঠিয়ে দিলেন কি না এক কলেজের ছোকরা!" হায় অদৃষ্ট! বাড়ীতেও বিমাতা; আবার বাড়ী ছাড়িয়া যে এত দূরে এল, এখানেও বড়কর্ত্তার কণ্ঠে বিমাতা আসীনা!

তখন গরিবের ছেলেদের জন্য দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজ ভিন্ন আর পড়িবার স্থান ছিল না। পরেশ দরখাস্ত লিখিয়া লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গেল। বাড়ী হইতে আসিবার সময় হেড মাষ্টার মহাশয় তাহাকে যে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্গে লইয়া গেল। বিদ্যা-

সাগর সত্যসত্যই দয়ার সাগর। তিনি পরেশের অবস্থার কথা শুনিয়া বিনা বেতনে তাঁহার কলেজে লইতে স্বীকার করিলেন। তাহার পর সেই মহাপুরুষ পরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কলেজের মাইনে যেন দিতে হবে না, বই কিনবে কোথা থেকে ?"

পরেশ বলিল "যিনি দয়া করে তাঁর আড়তে আমার থাকবার স্থান দিয়েছেন, আস্‌বার সময় তিনি আমাকে কুড়িটী টাকা দিয়েছেন, তারই ষোলটা টাকা এখনও আমার কাছে আছে ; তাই দিয়ে বই কিনবো।"

পরেশের কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন ; বলিলেন "দেখ্, তোর যখন দরকার হবে, আমায় বলিস্ ; আমি দিয়ে দেব।"

কৃতজ্ঞতাভরে তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল ! সে বেশ বুঝিতে পারিল, মাতৃহীনের জন্য ভগবান এখনও স্থান রাখিয়াছেন ; অনাথের জন্য অনাথনাথই ব্যবস্থা করিয়া দেন। পরেশ তখন সেই নর-দেবতার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। পরদিনই কলেজে ভর্ত্তি হইল। যে কয়খানা বই না হইলে নয়, তাহাই কিনিতে প্রায় পনর টাকা খরচ হইয়া গেল।

আড়তের গদিয়ান বড়কর্ত্তা মহাশয় পরেশের জন্য কিছু ব্যবস্থা করিলেন না ; যথাসময়েই রান্না হইতে লাগিল ; তাহার কলেজে যাইতে অযথা বিলম্ব হইতে লাগিল ; কিন্তু বড়কর্ত্তার ভয়ে কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। শেষে সে স্থির করিল যে, তাহার হাতে ত এখনও কিছু আছে। কলেজে যাওয়ার সময়

আহার করিবে না, বাজার হইতে কিছু কিনিয়া খাইয়াই সপ্তাহের পাঁচদিন কাটাইবে। শনিবার যখন কলেজ হইতে ফিরিবে, তখন ত আড়তের আহারাদি শেষ হইবে না; সে দিন দুই বেলাই ভাত খাইতে পাইবে। একবেলা না খাইলে ত মানুষ আর মরে না! কত গরিব লোক যে দুইবেলা খাইতে পায় না, তাহারা কি বাঁচিয়া নাই! আর কষ্ট না করিলে কি লেখাপড়া হয়! বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাই বিদ্যাসাগর হইয়াছেন। পরেশ সেই বিদ্যাসাগরের কৃপা লাভ করিয়াছে, তাঁহার মত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না কেন?

[৩]

পাঁচ সাত দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল। এত বড় আড়তের কেহ জিজ্ঞাসা করিল না যে, সে দ্বিপ্রহরে আহার করে না কেন, বা কোথায় আহার করে। যে যাহার কাজে ব্যস্ত; কে কাহার খোঁজ করে। যাহারা বড় গোমস্তা, তাহাদের কি এত জানিবার অবকাশ আছে!

পরেশ কিন্তু একজনের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। শনিবার তাড়াতাড়ি কলেজ হইতে আসিয়া যখন সে ভাত খাইতে গেল, তখন আড়তের ভাণ্ডারী অর্থাৎ প্রধান ভৃত্য হরিশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ গা বাবু, তোমাকে ত আর কোন দিন দুপুরবেলায় খেতে দেখি না; আর আজই বা এত দেরী করে খাচ্ছ কেন?"

পরেশ বলিল "সকাল-সকাল ত ভাত হয় না; তাই আমি

না খেয়েই কলেজে যাই। আজ শনিবার, হাফ কলেজ কি না; তাই এখন এসে ভাত খাচ্ছি।"

তাহার কথা শুনিয়া হরিশ বলিল "রোজ-রোজ না খেয়ে কলেজে যাও, সারাদিন না খেয়ে থাক। কৈ, এ কথা ত আমাকে একদিনও বল নি।"

পরেশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছলছল চক্ষে বলিল "আমার জন্য সকালে কে ভাত দেবে? এঁরা দয়া করে দুটো খেতে দেন, তাই পড়তে পারছি; তার উপর আবার কথা বল্‌তে ভয় করে; যদি বলেন, 'চলে যাও, এখানে হবে না', তা'হলে ত পড়া বন্ধ হবে।"

পরেশের কথা শুনিয়া হরিশের মনে বোধ হয় দয়ার সঞ্চার হইল; সে বলিল "আচ্ছা, সে কথা পরে শুন্‌বো। আহা, ছেলে-মানুষ, এত কষ্ট! তুমি বেশ ভাল করে খেয়ে নাও। ওগো চক্রবর্ত্তী, এ ছেলেটাকে আর একখানা মাছ দিয়ে যাও ত।"

বড়কর্ত্তাই হন আর বড় গোমস্তাই হন, এ কয়দিনে পরেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে,হরিশ ভাণ্ডারীই এই আড়তের অন্নদাতা; সকলকেই তাহার কথা রাখিতে হয়; কারণ তাহার মারফৎ অনেকেরই অনেক প্রাপ্তি আছে এবং আড়তের কর্ম্মচারীদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা হরিশের উপরই নির্ভর করে। বিশেষতঃ ছোটখাট গোমস্তাগণ এবং রাঁধুনি ব্রাহ্মণ ও ঝিয়ের দল সকলেই হরিশের কৃপায় দুইচারি পয়সা উপরি পাইয়া থাকে এবং নানা সুবিধাও ভোগ করিয়া থাকে। হরিশ ভাণ্ডারী অনেক দিন, বলিতে গেলে; প্রায় প্রথম হইতেই এই আড়তে আছে। স্বয়ং

কর্ত্তা হরিশকে বিশেষ ভাল বাসিতেন ; বড়বাবু ও ছোটবাবুও হরিশকে ভালবাসেন। গদিয়ান বড়কর্ত্তারও অনেক কীর্ত্তি হরিশ গোপন করিয়া রাখে। কাজেই আড়তে হরিশ ভাণ্ডারীর একাধিপত্য বলিলেই হয়।

পরেশ আড়তে আসিয়াই এ কথা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু এত বড় আড়তের এক বড় ভাণ্ডারীকে কিছু বলিতে সাহস পায় নাই। ভিক্ষার অন্নের ভাল-মন্দ বিচার করিতে নাই, এ কথা সেই পনর বৎসর বয়সেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল। বয়সে কিছু করে না, অবস্থাই মানুষকে সময়মত সব শিখাইয়া দেয়।

আড়ত-বাড়ীতে হরিশের নিজের একটি ছোট ঘর ছিল। সে ঘরে তাহার বাক্স, বিছানা, হিসাবপত্র থাকিত, পানের তামাকের সমস্ত সরঞ্জাম থাকিত, ভাণ্ডারের অন্যান্য দ্রব্যও থাকিত। হরিশ সে ঘরে কাহাকেও বড়-একটা প্রবেশ করিতে দিত না, কারণ সেটী তাহার মালখানা। সে কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও জানিত ; বাজারের হিসাব লিখিবার জন্য সে অপরের তোষামোদ করিতে যাইত না। তাহার অবসর-সময়ও খুব কমই ছিল। তাহা হইলেও কোন কোন দিন একটু সময় পাইলে সে রামায়ণ, মহাভারত, চরিতামৃত প্রভৃতি পাঠ করিত। হরিশ পরম বৈষ্ণব—মৎস্য মাংস খাইত না। বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। কৈবর্ত্তের ছেলে, বেশী লেখাপড়া শিখে নাই, তাই ভাণ্ডারীগিরি করিতে আসিয়াছিল এবং প্রায় ২৫ বৎসর এই আড়তে কাজ করিতেছে।

হরিশের আয়ও যথেষ্ট ছিল ; আড়ত হইতে মাসিক চারি

টাকা বেতন পাইত; কিন্তু গড়ে প্রতি মাসে যেমন করিয়া হউক ষাটি সত্তর টাকা উপায় করিত। প্রতিদিনের বাজার হইতে সে বেকসুর একটি করিয়া টাকা পাইত; যখন পাটের মরসুম লাগিত, সে কয়মাস সে দৈনিক দুই তিন টাকাও অনেক সময় বাজার-খরচ হইতে বাঁচাইত। তাহার পর ব্যাপারীদিগের নিকট তাহার প্রাপ্য ছিল। যে ব্যাপারী যে বৎসর সেই আড়তে যেমন কাজ করিত এবং লাভ করিত, সেই হিসাবে হরিশকে কিছু দিত; ব্যাপারীদের নিকট হইতে হরিশ সংবৎসরে তিন চারি শত টাকা পাইত। সুতরাং হরিশের গড়ে মাসিক আয় ৬০।৭০৲ টাকা, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

যে দিন হরিশের দৃষ্টি সৌভাগ্যক্রমে পরেশের উপর পতিত হইয়াছিল, সেই দিনই আহারান্তে হরিশ তাহাকে তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং একে একে প্রশ্ন করিয়া তাহার সমস্ত অবস্থা শুনিল। তাহার দুরবস্থা ও দুঃখের কথা শুনিয়া হরিশ একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আহা, মা নেই যার, কিছুই নেই তার; নইলে কি পরেশবাবু, তোমাকে এত কষ্ট করতে হয়। বিমাতার জ্বালা বড় জ্বালা। তাতেই ত আমি আর দ্বিতীয় সংসার করলাম না।"

এই বলিয়া হরিশ তাহার সাংসারিক অবস্থার কথা পরেশকে বলিল। তাহার সারাংশ এই যে, একটী কন্যা ব্যতীত এ সংসারে তাহার আর কেহই নাই। কন্যাটির যে বৎসরে বিবাহ হয়, সেই বৎসরই তাহার স্ত্রী পরলোকগত হন। সে প্রায় ৫ বৎসরের কথা। হরিশ আর বিবাহ করে নাই, করিবার ইচ্ছাও নাই।

সে বলিল "আর কি ঘর-সংসার করবো। মেয়েটিকে ভাল ঘরে ভাল বরে দিয়েছি। সে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। সম্প্রতি তার একটী পুত্র-সন্তান হয়েছে। যা কিছু আছে তা তাদেরই। যে কয়টা দিন বেঁচে আছি, এই গঙ্গাতীরেই থাকব, আর রাধাবল্লভের নাম করবো। তা দেখ, পরেশবাবু, তুমি কাল থেকে আর না খেয়ে কলেজে যেও না। যাতে সকাল সকাল ভাত হয়, তার বন্দোবস্ত আমি ক'রে দেব, বুঝেছ। আহা, ছেলেমানুষ!"

সোমবার হইতে নয়টার মধ্যে ভাতের বন্দোবস্ত হইয়া গেল। সে দিন পরেশ যখন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন হরিশ তাহার হাতে এক ঠোঙ্গা জলখাবার দিল। সে জলখাবার দেখিয়া বলিল "এ কি, আমার জন্য জলখাবার কে দিল?"

হরিশ বলিল, "কে দিল তাতে তোমার কি বাবু! সেই নয়টার সময় সুধু ডাল দিয়ে দুটো ভাত নাকে-মুখে দিয়ে গিয়েছ। আর পথও ত কম নয়! আমি হেদো চিনি; তা ছাড়িয়ে তোমায় যেতে হয়। যেতে-যেতেই ত ভাত হজম হয়ে যায়। আর এদিকে আড়তের রাত্রিতে ভাত সেই রাত এগারটার পর। এতক্ষণ কি তুমি কিছু না খেয়ে থাকতে পার। রোজ কলেজ থেকে এসেই জল খেও, আমি সব ঠিক করে রাখব।"

কোথায় বাড়ী, কোথায় ঘর এই হরিশ ভাণ্ডারীর;—সে তাহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া কাতর হইল; আর যাহারা তাহার আপনার জন—থাক্, সে কথায় আর কাজ নাই।

ইহার মাসখানেক পরেই আড়তের কর্ত্তা বড়বাবু—বংশীধর

তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল, পরেশও সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি পরেশকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে পরেশ, তুমি যে এখানে?" সে কথা বলিবার পূর্ব্বেই গদিয়ান বড়কর্ত্তা বলিলেন "ছোটবাবু একে এখানে থেকে কলেজে পড়বার জন্য পাঠিয়েছেন।" বড় বাবু বলিলেন "তা বেশ। খরচপত্র?" বড়কর্ত্তা বলিলেন "ছোট-বাবু আদেশ করেছেন বাসাখরচ দিতে হবে না।" বড়বাবু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন "হুঁ!" তখন আর কোন কথা হইল না।

পরেশ যথাসময়ে কলেজে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় বড়-কর্ত্তা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "শুনেছ হে ছোক্‌রা, বড়বাবু বলেছেন যে, তুমি যদি মাসে ছ-টাকা বাসাখরচ দিতে পার, তবেই তোমার এ আড়তে থাকা হবে। বাবুরা ত এখানে অন্নছত্র খোলেন নাই? এখন যা করতে হয় কর বাপু!"

পরেশের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যাঁদের এত বিষয়সম্পত্তি, যাঁদের পাতের উচ্ছিষ্ট থেকে তাহার মত দশটা গরিব ছেলে প্রতিপালিত হতে পারে, তাঁরা একটি ছেলেকেও দুবেলা দুমুটো ভাত দিতেও কাতর হইলেন। সকলই তাহার অদৃষ্ট! সে দেখিল লেখাপড়া শিক্ষা তাহার অদৃষ্টে নাই। যত্ন চেষ্টা সবই করিল; সকল রকম অসুবিধা, কষ্ট স্বীকার করিতেও প্রস্তুত ছিল; কিন্তু অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডন করিবে?

[৪]

সন্ধ্যার পর হরিশ ভাণ্ডারীর ঘরের মধ্যে ছোট একখানি মাদুর পাতিয়া বইগুলি সম্মুখে করিয়া পরেশ বসিয়া আছে। আজ আর তাহার পড়িতে মন লাগিতেছে না। পড়িয়া কি করিবে? চেষ্টা যত্নের ত ত্রুটী করিল না, কষ্ট স্বীকারও যথেষ্ট করিল। এখন বুঝিল তাহার অদৃষ্টে লেখাপড়া শিক্ষা নাই।

সে চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল, এমন সময় হরিশ কি কার্য্যোপলক্ষে সেই ঘরের মধ্যে আসিল এবং তাহাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল "পরেশবাবু, তুমি যে অমন ক'রে বসে আছ? পড়ছ না।"

পরেশ বলিল "আর পড়ে কি হবে?"

হরিশ বলিল "সে কি কথা! পড়বে না কেন?"

পরেশ বলিল "তুমি কি শোন নাই, বড়বাবু আমাকে বলেছেন যে, মাসে ছ-টাকা ক'রে বাসাখরচ না দিলে আমার এ আড়তে থাকা হবে না। তা, আমি টাকা কোথায় পাব। মাসে ছ-টাকা ক'রে কে আমায় দেবে?"

হরিশ বলিল "কৈ, এ কথা ত আমি শুনি নাই। তোমাকে কে বল্‌লে?"

সে বলিল "বড়কর্ত্তা আমাকে ডেকে বড়বাবুর হুকুম শুনিয়ে দিয়েছেন।"

হরিশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "এই ত কথা!

মাসে ছ-টাকা বাসাখরচ দিতে হবে শুনেই তুমি একেবারে পড়া ছেড়ে দেবার মতলব করেছ?”

সে বলিল “তা ছাড়া আর কি উপায় আছে। আমি যে বড় গরিব।” এই বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

হরিশ বলিল “আহা, ছেলেমানুষ, এতে কান্নার কি আছে? টাকা দিতে হয় দেওয়া যাবে। তোমার সে ভাবনা ভাবতে হবে না। তুমি মন দিয়ে পড়।”

পরেশ বলিল “টাকা আমি কোথায় পাব? বাবা ত আমাকে একটী পয়সাও দেবেন না।”

হরিশ বলিল “বাবা দেবেন না, তা আমিও জানি। পরেশ বাবু, আমি কি তোমার পড়ার খরচ চালাতে পারি নে। তোমার কোন ভয় নেই; আমি যে কয় দিন বেঁচে আছি, সে কয় দিন তোমার পড়ার কোন ভাবনা নেই।”

পরেশের চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। সে কথা বলিতে পারিল না। বুঝিল, নিরাশ্রয়ের একজন আশ্রয় আছেন; নইলে কোথাকার কে এই ছেলেটী, সম্পূর্ণ অপরিচিত;— তাহার জন্য হরিশ ভাণ্ডারীর হৃদয়ে এত দয়া কে সঞ্চার করিয়া দিল?

হরিশ তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল “না, আর ভাবনা-চিন্তে নাই; তুমি খুব মন দিয়ে পড়। তোমায় ত বলেছি, সংসারে আমার একটী মেয়ে; তা আমি যা গুছিয়ে রেখেছি, তাতে তাদের বেশ চল্‌বে। এখন তোমার পড়ার ভার আমিই নেব। কত টাকা কত দিকে কত রকমে খরচ

হয়ে যায়, আর তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, তোমার জন্য মাসে মাসে কিছু কি আর খরচ করতে পারব না।”

এ কথার আর সে কি উত্তর দিবে; চুপ করিয়া রহিল। হরিশ কি ভাবিতে ভাবিতে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

আড়তের রাত্রির আহার শেষ হইতে প্রত্যহই বারটা বাজিয়া যায়। পরেশ এগারটার সময় আহার শেষ করিয়াই শয়ন করে। আজ আর তাহার নিদ্রা আসিতেছে না; অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া সে শয্যা ত্যাগ করিল; বাহিরে আসিয়া হরিশের ঘরের সম্মুখে যে বেঞ্চ পাতা ছিল, তাহাতেই বসিয়া রহিল।

হরিশ সেখান দিয়া অনেকবার যাতায়াত করিবার সময় পরেশকে বসিয়া থাকিতে দেখিল, কিন্তু কোন কথাই বলিল না। আড়তের রাত্রির আহারাদির ব্যাপার শেষ হইলে, হরিশ তাহার ঘরের নিকটে আসিয়া বেঞ্চের পার্শ্বেই দুয়ারের চৌকাটের উপর বসিল; বলিল “পরেশবাবু, তুমি এখনও ঘুমাও নাই।”

পরেশ বলিল “ঘুম আস্‌চে না, তাই ব’সে আছি। দেখ, তোমার নাম ধ’রে ডাক্‌তে আমার কেমন যেন বাধবাধ ঠেকে; আমি তোমায় কি ব’লে ডাকব, তাই ব’লে দেও। আর তুমিও আমাকে বাবু বলে ডেক না। আমি ত বাবু নই, আমি যে বড় গরিব।”

হরিশ বলিল “গরিব হ’লে বুঝি আর বাবু হয় না, পয়সা থাক্‌লেই বাবু হয়! এই বুঝি তুমি লেখাপড়া শিখেছ। বাবু গরিবই হয়, বড়মানুষে বাবু হয় না; যারা একটা গরিব ছেলেকে

খেতে দিতে পারে না, তারাই বুঝি বাবু! যাক্ গে সে কথা। তা তুমি যদি আমার নাম ধরে ডাক্তে না চাও, তা হলে তোমার যা বল্‌তে ইচ্ছে, তাই বোলো; আমিও তোমাকে পরেশ বলেই ডাক্‌ব।"

পরেশ বলিল "আজ থেকে তুমি আমার কাকা, আমি তোমাকে হরিশ কাকা বলে ডাকব। কেমন?"

হরিশ হাসিয়া বলিল "আরে বাবা, বাবা-কাকা হওয়া কি সোজা। দেখ পরেশবাবু—না না পরেশ, আমি একটা কথা আজ এই সন্ধে থেকে ভাবছি। আমি বলি কি, মাসে ছ-টাকা দিয়ে এত কষ্ট করে এখানে থেকে তোমার কাজ নেই। এখান থেকে কলেজও অনেক দূর, যেতেও কষ্ট হয়। তার পর দেখ, এরা তোমার গ্রামের লোক; এদের এখানে টাকা দিয়ে থাকার চাইতে অন্য যায়গায় যাওয়াই ভাল। আমি বলি কি, তুমি তোমার কলেজের কাছে কোন ছেলেদের বাসা ঠিক ক'রে সেখানেই থাকার ব্যবস্থা কর। অবশ্য এখানে থাক্‌লে আমার চোখের উপর থাক্‌তে; কিন্তু আমি ত এদের চাকর; আমি এখানে আর তোমার কত কি সুবিধাই বা করতে পারি। সেই নটার সময় ছুটো যা-তা মুখে দিয়ে এতটা পথ হেঁটে যেতে হয়, তার পর সেই রাত্রি এগারোটা-বারটায় এই আড়তের ভাত। এতে কি তোমার মত ছেলেমানুষের শরীর টিক্‌বে। তাই আমার ইচ্ছে যে, তুমি কোন বাসায় যাও। সেখানে থাক্‌তে গেলে কতই বা খরচ হবে—এই ধর না, পনর টাকা কি কুড়ি টাকা। তা আমি মাসে মাসে তোমাকে

দিতে পারব। তার পর যখন যা দরকার হবে, আমি দিয়ে আসব। কখন বা তুমি এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেও, কোন দিন বা আমি তোমাকে দেখে আসব। কেমন, এই ভাল না!"

পরেশ কি বলিবে; অবাক্ হইয়া হরিশ ভাণ্ডারীর দিকে চাহিয়া রহিল। এ কি মানুষ না দেবতা! তাহার চক্ষে জল আসিল; তাহার স্বর্গগতা মায়ের কথা মনে হইল। এত স্নেহ যে সে সহ্য করিতে পারে না—এত স্নেহ যে মাতার মৃত্যুর পর হইতে একদিনও সে পায় নাই!

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হরিশ বলিল "কি, তুমি যে কথা বলছ না। আমি যা বল্লাম, তাতে কি তুমি সম্মত নও। আমার কাছে কিছু গোপন করো না। তোমার ইচ্ছা কি, আমাকে বল।"

পরেশ চক্ষের জল মুছিয়া বলিল "হরিশ কাকা, তুমি আর জন্মে আমার কে ছিলে? দেখ, মা মারা যাবার পর এত স্নেহ ত আমি কারো কাছে পাই নাই। কত কষ্ট করে, ছোটবাবুর হাতে-পায়ে ধরে কল্‌কাতায় এসেছিলাম। এখানে আপনার বল্‌বার কেউ ছিল না; সংসারেও আমাকে স্নেহ করবার কেউ নেই। তবে তুমি এলে কোথা থেকে? আমি তাই ভাব্‌ছিলাম। আমি ত তোমার কেউ নই; তুমি ত আমাকে এই কয়দিন মাত্র দেখ্‌ছ। তুমি আমার জন্য এত টাকা খরচ করবে? তুমি—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া হরিশ বলিল "কে কার আপনার

বাবা! এ সংসারে কেউ কারো নয়। শ্রীগৌরাঙ্গ যার উপর যার ভার দিয়েছেন, সে তাই করবে। তিনি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি মূর্খ মানুষ, লেখাপড়া জানিনে! আমি এই বুঝি, আমি কি তোমার সাহায্য করছি,—আমার কি সাধ্যি। আমি পরের বাড়ী চাকরের কাজ করে দিন কাটাই; আমার কি শক্তি আছে যে তোমাকে সাহায্য করব। যাঁর দরকার, তিনিই আমার হাত দিয়ে তোমাকে কিছু দেবার আদেশ করেছেন। আমি তাই করছি। থাক্, সে কথায় কাজ নেই। রাত একটা বাজে। তুমি শোও গে। কালই একটা বাসা ঠিক কর; ভাল ছেলেদের সঙ্গে থাক্‌বার ঠিক করো। তারপর তোমার কি কি জিনিষের দরকার হবে, তা সব আমাকে বলে দিও, আমি কিনে এনে দেব। যাও, এখন শোও গিয়ে; আর বসে থেক না।"

পরেশ তখন সেখান হইতে উঠিয়া বিছানায় যাইয়া শয়ন করিল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। সে শুধুই ভাবিতে লাগিল, যাঁহাদের আশ্রয়ে আসিয়াছিল, তাঁহারা কত বড় লোক, তাঁদের পাতের ফেলা ভাতে তাহার মত একটা গরিবের ছেলের পেট ভরে; তাঁহারা তাহাকে স্থান দিলেন না। আর হরিশ ভাণ্ডারী তার কেউ নয়; এক মাস আগে সে তাহাকে চিন্‌তও না, সেই কি না তাহাকে আশ্রয় দিল। সে ভাবিতে লাগিল—এই পরামাণিক বাবুরাই বড়, না তাদের বাড়ীতে যে চাকর, যে চার টাকা মাইনে পায়, সেই হরিশ ভাণ্ডারীই বড়!

[৫]

কায়স্থের ছেলে এই পরেশ বড় গরিব,—তাই সকল স্থানেই সে অতি সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকিত। তাহাদের কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অনেক ছাত্র; কিন্তু কাহারও সহিত কথা বলিতে তাহার সাহস হইত না। তাই এতদিনের মধ্যে একটী ছেলের সঙ্গেও তাহার পরিচয় হয় নাই; হয় ত তাহার মলিন বেশ এবং পাড়াগেঁয়ে ভাব দেখিয়া অন্য কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক হয় নাই।

যে রাত্রির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার পরদিন যথাসময়ে আড়তে আহার শেষ করিয়া পরেশ কলেজে চলিয়া গেল। কলেজে প্রতিদিনই সে পিছনের দিকে একখানি বেঞ্চে বসিত; সম্মুখ দিকের কোন বেঞ্চে স্থান থাকিলেও সে অগ্রসর হইত না, —ভয়, যদি কেহ আসিয়া তাহাকে সেখান হইতে তুলিয়া দেয়। কলিকাতার ছেলেদের হাবভাব, চলাফেরা দেখিয়া তাহাদের গা-ঘেঁসিয়া বসিতেও তাহার সাহসে কুলাইত না। সেই জন্য সে পিছন দিকে একটা স্থান একেবারে ঠিক করিয়া লইয়াছিল। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন এ-ঘরে একঘণ্টা, সে-ঘরে একঘণ্টা এমন করিয়া পাঠ লইতে হইত না; ছাত্রেরা এক ঘরেই বসিয়া থাকিত, অধ্যাপক মহাশয়েরা নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টায় আসিয়া পড়াইয়া যাইতেন। তবে সে সময়ও কেমিষ্ট্রি পাঠ্য ছিল; যাহারা কেমিষ্ট্রি পড়িত, তাহাদিগকেই অন্য ঘরে যাইতে হইত। পরেশ কেমিষ্ট্রি

পড়িত না ; সুতরাং তাহাকে আর এ-ঘর ও-ঘর ছুটাছুটি করিতে হইত না।

আজ কয়দিন হইতে সে দেখিয়া আসিতেছে যে,একটী ছেলে তাহার পাশে আসিয়া প্রতিদিন বসে। সেও তাহারই মত চুপ করিয়া পড়াশুনা করে, কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলে না, বা গল্প করে না। তাহা হইলেও এ কয়দিন পরেশ তাহার সহিত কথা বলে নাই, সেও তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। আজ কিন্তু তাহার চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না—আজ যে তাহার বাসা ঠিক করিতে হইবে। সেই জন্য আজ সাহসে নির্ভর করিয়া সে তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার কি কলিকাতায় বাড়ী ?"

ছেলেটী তাহার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল "কেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?"

পরেশ বলিল "আমার একটু দরকার আছে, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

ছেলেটী বলিল "কি দরকার বলুন না।"

পরেশ বলিল "আমি এই কলেজের নিকটে একটা 'মেস' পেলে সেখানে থাকি। আমায় দূর থেকে আসতে হয়, আর যেখানে থাকি, সেটা একটা আড়ত; সেখানে থেকে পড়ার সুবিধা হচ্চে না; তাই আপনার কাছে সন্ধান নেবার জন্যে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া ছেলেটী বলিল "না, আমার বাড়ী কলিকাতায় নয় ; আমি ঢাকা জিলার লোক। আমি মুন্সীগঞ্জ

স্কুল থেকে পাস করে এসেছি। এখানে মেসে থাকি। এই কাছেই, যুগলকিশোর দাসের লেনে আমাদের মেস। তা, বেশ ত, আপনি যদি থাক্‌তে চান, আমাদের 'মেসে' আমারই ঘরে একটা 'সিট' খালি আছে; আপনি বেশ থাক্‌তে পারবেন। আপনার নামটা কি?"

পরেশ বলিল "আমার নাম শ্রীপরেশনাথ ঘোষ।"

ছেলেটী বলিল "আমার নাম শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত, আমরাও কায়স্থ। আমি পনর টাকা স্কলারশিপ পাই, আর আমার বাবা মাসে ৮৲ টাকা পাঠান; তাতেই আমার বেশ চলে যায়; কিছু বাঁচেও।"

পরেশ বলিল "মাসে আপনার তেইশ টাকা খরচ লাগে। আমি কি এত টাকা দিতে পারব।"

অমর বলিল "কেন? আপনার বাবা কি কুড়ি পঁচিশ টাকা মাসে মাসে দিতে পারবেন না।"

"বাবা আমাকে একটী পয়সাও সাহায্য করবেন না; আমি এখানে এসে এক কাকা পেয়েছি, তিনিই আমার খরচ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি কি এত টাকা দিতে পারবেন?"

অমর জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কি করেন? কত বেতন পান?"

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে পরেশের একটু গোপন করিবার প্রয়োজন বোধ হইল; কি জানি, আড়তের ভাণ্ডারী তাহার কাকা, তিনি তাহার খরচ দিবেন, শুনিয়া ইনি যদি তাহাকে তাঁহাদের মেসে নিতে স্বীকার না করেন। কিন্তু পরক্ষণেই সে

তাহার এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল —বেশ, গোপন করিতে যাইব কেন? হরিশ কাকার মত হৃদয় কয় জনের—কয় জন বড় মানুষের? বেশ ত, সে ভাণ্ডারীগিরিই করে, তাতে কি গেল এল! না, আমি গোপন করিব না!

পরেশ বলিল "আমার সে কাকা এখানে এক আড়তে ভাণ্ডারীগিরি করেন। তিনিই আমার খরচ দেবেন।"

পরেশ যাহা ভয় করিয়াছিল, তাহা অমূলক। অমর একটু হাসিয়াই বলিল "পরেশ বাবু, আপনি হয় ত কথাটা বল্‌বার আগে একটু ভাব্‌ছিলেন। আপনার কাকা ভাণ্ডারীর কাজ করেন, সে কথাটা বল্‌তে হয় ত একটু লজ্জা বোধ হচ্ছিল। কিন্তু, আমার বাড়ী যে ঢাকা জিলায়—আমি যে বাঙ্গাল—আমি যে পাড়াগেঁয়ে। এই কলিকাতার ছেলেরা কথাটা শুন্‌লে হয় ত নাক খাড়া করত; কিন্তু আমরা তা করিনে। জানেন ত—

Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear.

যাক্ সে কথা। তা হলে আপনি কবে থেকে আসবেন বলুন। আমি ঠিক করে দেব। খরচ এই কলেজের মাইনে শুদ্ধ বড় বেশী হ'লে কুড়ি একুশ টাকা, কখনও বা তার চাইতে কম হবে—বেশী কখনও হবে না। তা হ'লে এই ঠিক রইল। আজই কলেজের পর আপনি আমাদের মেসটা দেখে যাবেন; তারপর কাল কি পরশু এসে পড়বেন।"

পরেশ বলিল "আজ আপনার সঙ্গে গিয়ে বাড়ীটা দেখে

যাব; কিন্তু থাকৃব কি না, তা কা'ল বলব; কাকাকে জিজ্ঞাসা করে তবে কাল সংবাদ দেব।"

অমর বলিল "বেশ, তাই হবে।"

সেই দিন কলেজ বন্ধ হইলে পরেশ অমরের সঙ্গে তাহার যুগলকিশোর দাসের লেনের বাসা দেখিতে গেল। সেই মেসে দক্ষিণদেশী একটী ছেলেও ছিল না,—সকলেই পূর্ব্ব-বঙ্গের ছেলে। অমর তিন-চারিটী ছেলের সঙ্গে তাহার পরিচয় করিয়া দিল। তাঁহারা তাহাকে জল খাওয়াইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না,—বলিল "কাল এসে জল খাব।"

আড়তে ফিরিয়া আসিয়া পরেশ হরিশকে সমস্ত কথা বলিল।

হরিশ বলিল "সে ভাল কথা; টাকার জন্য আমি ভাবছিনে; কিন্তু সে বাসার ছেলেগুলো কেমন, বাসাটা কেমন, ঝি-বামুন কেমন, এ সব নিজের চক্ষে না দেখে আমি কিছুই ঠিক করতে পারব না। তোমাকে যে যেখানে-সেখানে রাখব, তা হবে না; —এ কল্‌কাতা বড় ভয়ানক স্থান।"

পরেশ বলিল "আড়তের কাজকর্ম্ম ফেলে তুমি কি করে আমার সঙ্গে যাবে?"

হরিশ একটু ভাবিয়া বলিল "আচ্ছা, কা'ল তোমাদের ছুটী হবে কখন?

"আড়াইটার সময়।"

হরিশ বলিল "তা হ'লে আর অসুবিধা কি। আমি ঠিক আড়াইটার সময় তোমাদের স্কুলের দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে

থাক্‌বো। তুমি বেরিয়ে এলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সেই বাড়ীতে যাব। তুমি চিনে যেতে পারবে ত ?”

পরেশ বলিল “অমর বাবুকে ঠেকিয়ে রাখব।”

তাহাই স্থির হইল। পরদিন কলেজে যাইয়া সে অমরকে বলিল “আমার কাকা আজ বাসাটা দেখ্‌তে আস্‌বেন। তিনি ঠিক আড়াইটার সময় আস্‌বেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেখিয়ে-শুনিয়ে সব ঠিক করে ফেলা যাবে। তিনি যদি সম্মত হন, তাহা হইলে দুই একদিনের মধ্যেই সব জিনিসপত্র নিয়ে আস্‌তে পারব।”

[৬]

আড়াইটার সময় কলেজ বন্ধ হইবামাত্র অমর ও পরেশ বাহিরে আসিয়াই দেখে হরিশ গেটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। হরিশের কাঁধে একখানি চাদর, পায়ে একজোড়া চটি জুতা—ছাতাটাও হাতে নাই।

পরেশ অমরকে বলিল “অমর বাবু, এই আমার হরিশ কাকা।”

অমর এই কথা শুনিয়া হরিশকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে হরিশ বলিল “ও কি বাবা ; ও কি কর। অমনিই বল্‌ছি, সুখে থাক বাবা। তোমার কথা পরেশের কাছে কাল সব শুনেছি বাবা! তবুও একবার দেখ্‌তে এলাম। তা তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে, তুমি বড় ভাল ছেলে ; তোমার কাছে পরেশকে রাখ্‌তে আমার আর ভাবনা হচ্চে না। বুঝেছ বাবা, অনেক

কাল কল্‌কাতায় আছি, অনেক লোক দেখেছি। এখন তাই লোক দেখ্‌লেই বল্‌তে পারি—ভাল কি মন্দ! তা, এতদূর যখন এসেছি, তখন বাসাটা দেখেই যাই।”

তাহার পর তাহারা তিন জনে যুগলকিশোর দাসের লেনের ‘মেসে’ উপস্থিত হইল। হরিশ সকলের সঙ্গেই বেশ হাসিয়া কথা বলিল; সকলেই তাহার কথাবার্ত্তায় সন্তুষ্ট হইল। হরিশ যে ভাণ্ডারী, তাহা তাহার কথার-বার্ত্তায় কেহই বুঝিতে পারিল না, অমর বাবুও সে কথা বলিল না।

সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ হইলে হরিশ বলিল “সবই ত দেখা হ’ল; কিন্তু বাপসকল, যাদের হাতে তোমাদের প্রাণ, তাদের না দেখে ত যেতে পারছি নে।”

অমর বলিল “তারা আবার কে?”

হরিশ বলিল “তারা তোমাদের বামুন-ঝি; এই কল্‌কাতা সহরে যিনি যত বড়ই হোন না, সকলেরই প্রাণ সেই ঝি-বামুনের হাতে।”

হরিশের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল, এমন সময়ে মেসের ঝি আসিল। তাহাকে দেখিয়াই হরিশ বলিল “ওগো, তুমিই বুঝি এ বাসার ঝি।”

ঝি ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল।

হরিশ বলিল “তা তোমাকে দেখে ত ভাল ব’লেই বোধ হচ্চে। তোমার হাতেই আমার এই ভাইপোটিকে দিয়ে যাব, একটু দেখো-শুনো। আর এই সব সোণারচাঁদ ছেলেরা আছে, একটু মায়া-মমতা কোরো।”

ঝি বলিল "সে কথা আর বল্‌তে হবে না গো! এরা সবাই আমাকে খুব মান্যি করে, ভয়ও করে। আমি যা বলি, তাই সবাই শোনে। আমিও সব্বাইকে সমান দেখি—তা কে বা জানে বড়মানুষের ছেলে, কে বা জানে গরিবের ছেলে;— আমার কাছে বাবু সব এক। কি বল গো!"

হরিশ বলিল "এই ত ঠিক কথা। তোমার সঙ্গে ত জানা-শুনা হোলো; কিন্তু তোমাদের ঠাকুর কখন আসবে।"

ঝি বলিল "ওগো, তার কি সময় হয়। সে ই-ই পাঁচটায়—একবারে ঘড়ি ধরে।"

হরিশ বলিল "তা হ'লে তাঁর দর্শন-লাভ আর আজ হোলো না; আর এক দিন আস্‌ব। এখন, এখানে থাক্‌তে হ'লে কি কি লাগ্‌বে, তার একটা ফর্দ্দ তোমরা কেউ ক'রে দেও না বাবা! সেগুলো ত কিন্‌তে হবে। দরও লিখে দিও। আমি দুই এক দিনের মধ্যেই সব গুছিয়ে এ-গাছিয়ে পরেশকে রেখে যাব।"

তখন দুই তিন জন ছাত্র বসিয়া ফর্দ্দ করিতে লাগিল। বলিতে গেলে পরেশের ত কিছুই ছিল না; সুতরাং সব জিনিষই ফর্দ্দমত কিনিতে হইবে।

চারিটার সময় তাহারা "মেস" হইতে বাহির হইল। রাস্তায় আসিয়া পরেশ বলিল "হরিশ কাকা, এ যে অনেক টাকার ফর্দ্দ!"

হরিশ বলিল "কত টাকা?"

"পঁয়তাল্লিশ টাকা, তবুও ত যে দুই চারখানা বই লাগবে, তা ধরাই হয় নাই। না, কাকা, অত টাকা খরচ করে কাজ নেই।

তুমি মাসে ৬৲ টাকা আড়তে দিও, আমি তোমার কাছে থেকে কোন কষ্টই পাব না।"

হরিশ বলিল "সে পরামর্শ তোমাকে দিতে হবে না বাবা! হরিশ ভাণ্ডারী ও-রকম কত পঁয়তাল্লিশ টাকা এককালে বদ্-খেয়ালে উড়িয়েছে। সে তোমার ভাবতে হবে না। চল।"

পরেশ নীরবে তাহার অনুসরণ করিল।

[৭]

আড়তে ফিরিয়া আসিবার পর হরিশ পরেশকে বলিল "দেখ পরেশ, আজও বাবুদের কিছু ব'লে কাজ নেই। এখানে ত তোমার জিনিসপত্র বেশী কিছু নেই। যা যা দরকার, কাল সব কিনে তোমার বাসায় রেখে এস; তার পরদিন বাবুদের ব'লে বিদায় হ'য়ে যেও। আমার নাম কোরো না; বোলো অন্য স্থানে তোমার থাকবার সুবিধা হয়েছে; এখানে খরচ দিয়ে থাকা তোমার অবস্থায় কুলিয়ে উঠ্‌বে না।"

পরেশ বলিল "হরিশ কাকা, এখানে থাক্‌লেই ভাল হোতো। তোমার কাছেই থাক্‌তাম, খরচও কম হোতো। তুমি আমার জন্য মাসে মাসে এতগুলি টাকা খরচ কেন করতে যাচ্ছ। আমি তোমার কে, হরিশ কাকা!"

হরিশ বলিল "কেউ কারো নয় বাবা, কেউ কারো নয়। আমি তোমার কেউ নই, তুমিও আমার কেউ নও। শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাকে আমার হাতে দিলেন, আমি তাঁরই কাজ করছি। তুমি আমার কে? খরচপত্রের কথা বারবার তুল্‌ছ কেন? বাসায়

ত তোমাকে বলেছি যে, এই হরিশ ভাণ্ডারী বদ্‌খেয়ালে মাসে কত টাকা উড়িয়েছে। কাল আমি তোমাকে পঁচিশটা টাকা দেব। তুমি তোমাদের সেই বাসায় গিয়ে যে বাবুটী তোমার বন্ধু, তাঁকে সঙ্গে করে যা যা দরকার, সব কিনে নিয়ে এসো। আর শোন, তুমি এখান থেকে গিয়ে আর কখন এ আড়তে এস না। আমি মধ্যে মধ্যে নিজে গিয়ে তোমার খোঁজ নিয়ে আসব। তোমার যদি কখন কিছু দরকার হয়, আর আমি যদি ঠিক সেই সময় না যেতে পারি, তা হলেও তুমি আমাকে চিঠি লিখো না। আজ সন্ধ্যার সময় তোমাকে একটা স্থানে নিয়ে যাব; সেখানে এসে বল্‌লেই তোমার যখন যা দরকার সব পাবে।"

পরেশ বলিল "সে কোথায় হরিশ কাকা?"

হরিশ একটু হাসিয়া বলিল "সে গেলেই জান্‌তে পারবে। না, তুমি আবার কলেজে পড়,—কথাটা এখনই বলি। শোন, তোমাকে ত এখনই বল্‌লাম যে, আমি এক কালে বদ্‌খেয়ালে কত টাকা উড়িয়েছি। কথাটা কি জান; যখন আমার বয়স ছিল, হাতেও কাঁচা পয়সা খুব আস্‌ত, তখন আমার স্বভাব একটু খারাপ হয়েছিল। সেই সময় আমার একটা উপসর্গ জুটেছিল। এখন আর সে সব খেয়াল নেই, কিন্তু তাকে এখনও প্রতিপালন করতে হয়। তাকে আমি মাসে-মাসে কিছু দিই। তারও এখন কোন বদ্‌খেয়াল নেই; আমি যা দিই, তাতেই তার দিন চলে যায়; আর তার হাতেও কিছু আছে। তাকে দেখ্‌লে তুমি বুঝ্‌তেও পারবে না যে, সে এক কালে খারাপ ছিল। আমি তাকে বড়ই বিশ্বাস করি; আর সেও এখন আমাকে আর পূর্ব্বের

চক্ষে দেখে না—খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তোমার কথা তাকে বলেছিলাম। সে ত তোমাকে তার বাড়ীতে রাখতে চেয়েছিল। আমিই তাতে মত দিই নি। তুমি কায়স্থের ছেলে, তুমি তার হাতে খাবে কি করে; বিশেষ এক কালে সে কত অন্যায় কাজ করেছে; এখনই না হয় ভাল হয়ে গেছে। তাকে দেখ্‌লেই তোমার ভক্তি হবে পরেশ।”

হরিশের কথাটা পরেশের প্রথমে ভাল লাগিল না;—তাই ত তাহাকে একটা বেশ্যার বাড়ী যাইতে হইবে;—জীবনে ত এমন কাজ সে করে নাই। পরক্ষণেই মনে হইল—তাতে কি! যিনি এই দুঃসময়ে তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—যাঁহাকে সে কাকা বলিয়া ডাকে, তিনি তাহাকে যেখানে লইয়া যাইবেন, সেখানেই সে যাইবে, তাঁহারই সঙ্গে ত যাইবে। সে কোন দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিল “বেশ, আমি সন্ধ্যার সময় তোমার সঙ্গে যাব।”

সন্ধ্যার সময় হরিশ তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বাহির হইল। আড়ত হইতে একটু যাইয়াই পরেশ জিজ্ঞাসা করিল “হরিশ কাকা, কত দূর যেতে হবে?”

হরিশ বলিল “আর বেশী দূর নয়, ঐ বাঁয়ের দিকের গলির মধ্যেই দুর্গার বাড়ী।”

একটু যাইয়াই তাহারা বাঁয়ের গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। দুই তিনখানি কোঠা-বাড়ীর পরই ছোট একখানি খোলার ঘর। সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল, ঘরের বাহিরের দ্বার ভিতর দিক হইতে বন্ধ। হরিশ দ্বারের কড়া নাড়িল।

একটু পরেই একটী স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। হরিশ অগ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ডাকিল "এস পরেশ।" তাহার পর সেই স্ত্রীলোকটীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল "দুর্গা; এই পরেশ, আমার ভাইপো!"

স্ত্রীলোকটী এই কথা শুনিয়া বলিল, "এস বাবা, এস। আজ কয়দিন থেকে তোমার কথা শুনে, তোমাকে একবার আমার বাড়ীতে আনতে বল্‌ছি ; আজ সময় হ'ল বুঝি।"

হরিশ বলিল "এ কয়দিন আড়তেও কাজ ছিল। তার পর জান ত' পরেশের একটা থাক্‌বার স্থান ঠিক কর্‌তে হোলো। আজ একটা ছেলেদের বাসা দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। বাসার ছেলেরা বেশ ভাল। সব ঠিক হয়ে গেছে। ওকে কাল না হয় তার পর দিন নূতন বাসায় রেখে আস্‌ব। আহা! আড়তে কি কষ্টে ওর দিন গিয়েছে! এইটুকু ছেলে, অনেক দিন না খেয়ে কলেজে গিয়েছে!"

স্ত্রীলোকটি পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "আহা, এত কষ্ট করেছ বাবা! যাক্‌ আর তোমার কষ্ট করতে হবে না।" হরিশকে বলিল "দেখ, ছেলেটীকে দেখ্‌লেই মায়া হয়। মা নেই কি না?"

হরিশ বলিল "মা না থাক্‌লেই যে বাপ এমন নিদয় হয়, এ আর কখন শুনি নি।"

স্ত্রীলোকটী বলিল "বিমাতা যে কত কষ্ট দেয়, তা আর আমার জান্‌তে বাকী নেই। যাক্‌ সে কথা; বাবা! তুমি কলেজ থেকে এসে কি খেয়েছ।"

পরেশ বলিল "আজ যে নূতন বাসায় যাব বলে গিয়েছিলাম, তারাই জল খাইয়েছে।"

স্ত্রীলোকটীর বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। হরিশ যে বলিয়াছিল, সে কথা; ঠিক—স্ত্রীলোকটিকে দেখিলেই ভক্তি হয়।

বারান্দায় দুখানা জলচৌকী পাতা ছিল। স্ত্রীলোকটী বলিল "বোস না বাবা, ঐ চৌকীর উপর বোস; তুমিও বোস না হরি-ঠাকুর।"

তাহারা বসিলে স্ত্রীলোকটী একে একে পরেশের বাড়ীর সমস্ত সংবাদ লইল; এমন ভাবে কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, সে না বলিয়া থাকিতে পারিল না। বাড়ীতে বিমাতার নিকট কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে, তাহা যখন সে বলিতে লাগিল, তখন স্ত্রীলোকটী অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিল। পরেশের তখন মনে হইল এমন দয়াময়ী কি বেশ্যা হইতে পারে? দেশেও বেশ্যা দেখিয়াছি, কলিকাতাতেও কত দেখিতেছি। তাহাদের দেখিলে ভয় হয়—ঘৃণা হয়; আর ইহাকে দেখিলে মনে ভক্তিরই উদয় হয়। না, হরিশ কাকা আমার সঙ্গে তামাসা করিয়াছে, আমার মন বুঝিবার জন্য আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে।

পরেশ এই সকল কথা ভাবিতেছে, এমন সময় হরিশ বলিল "পরেশ, তা হলে তুমি একটু বোসো; আমি আড়তে যাই; আমার ত আর বিলম্ব করা চলবে না। তুমি পথ চিনে যেতে পারবে ত? এই গলি থেকে বেরুলেই বড় রাস্তা। সে

রাস্তা ত তুমি জানই। তোমার যখন যা দরকার হবে, দুর্গার কাছ থেকে নিয়ে যেও ; বুঝলে।”

পরেশ বলিল “আমিও তা হলে তোমার সঙ্গে যাই চল। আমি এ বাড়ী চিনে ঠিক আসতে পারব।” এই বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

দুর্গা বলিল “না বাবা, তুমি একটু বোসো। হরিঠাকুর, কিছু খাবার এনে দিয়ে যাও। তোমাদের আড়তে সেই ত রাত্রি বারটার সময় ভাত হবে। ছেলেমানুষ এতক্ষণ না খেয়ে কেমন করে যে থাকে, তাই আমি ভাব্‌ছি।”

পরেশ বলিল “আমার এখন ত ক্ষিদে পায় নি। আমার কোন কষ্টই হয় না—আমি যে বড় গরিব। হরিশ-কাকাকে কত বল্‌লাম যে, আমি তোমার কাছেই আড়তে থাকি, মাসে ছয় টাকা করে খরচ দিলেই হবে। ‘মেসে’ যেমন করে হোক পঁচিশ টাকা ত লাগ্‌বে। হরিশ কাকা সে কথা কিছুতেই শুন্‌বে না।”

দুর্গা বলিল “না বাবা” হরিঠাকুর যা ঠিক করেছে, তাই ভাল। যারা এত বড়মানুষ হয়েও গাঁয়ের একটা গরিব ছেলেকে দুটো ভাত দিতে কাতর, তাদের কাছে কি থাক্‌তে আছে। না, তুমি সেই ছেলেদের বাসাতেই যাও। ও ঠাকুর, খাবার আন্‌তে গেলে না।”

পরেশ বলিল “না, আজ কাজ নেই। আমি আর এক দিন এসে খাব।”

দুর্গা বলিল “তবে তাই হোক। দেখ বাবা, কালই একবার

এসো। তোমায় সবে আজ দেখ্‌লাম; কিন্তু আমার মনে হচ্চে তুমি যেন আমারই ছেলে; পূর্ব্বজন্মে তুমি নিশ্চয়ই আমার কেউ ছিলে।"

পরেশ বলিল "আমারও তাই মনে হয়। দেশে কত গরিব আছে; কিন্তু হরিশ কাকা আমাকেই এত ভালবাসে কেন?"

হরিশ বলিল "ওরে বাবা, কে কাকে ভালবাসে। তোঁকে ত বলেছি, শ্রীগৌরাঙ্গ তোর ভার আমার উপর দেবেন ব'লে তোকে এই আড়তে এনে দিয়েছেন। আমি কি করব—তাঁর আদেশ!"

দুর্গাও বলিয়া উঠিল "ঠিক তাই হরিঠাকুর—ঠিক তাই। কার কাজ কে করে! আমার মত পাপীর মন এমন হবে কেন? তা বাবা, আজ যাও, কাল আবার এসো।"

পরেশ হরিশের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া বলিল "হরিশ কাকা, এ ত বেশ্যা নয়। তুমি আমার সঙ্গে তামাসা করেছিলে।"

হরিশ বলিল "কে যে কি, তা আমরা সামান্য মানুষ, আমরা কি করে বল্‌ব—কি করে বুঝব।"

[৮]

এই স্থানে হরিশ ভাণ্ডারীর একটু বিস্তৃত পরিচয় দিই। হরিশ জাতিতে কৈবর্ত্ত; তাহার পুরা নাম হরিশচন্দ্র দাস। তাহার পিতা নন্দকুমার দাসের বড়ই বাসনা ছিল যে, একমাত্র পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবে, তাহাকে আর কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। সেই জন্য নন্দকুমার হরিশকে তাহাদের গ্রাম

হইতে দুই মাইল দূরে কেশবপুরের এক বাংলা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল।

হরিশের কিন্তু লেখাপড়ায় মন ছিল না। সে যথাসময়ে বই শ্লেট লইয়া স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইত; কিন্তু সকল দিন স্কুলে যাইত না। এখানে-সেখানে, এ-পাড়ায় সে পাড়ায় অসৎ-চরিত্র ছেলেদের সহিত সারাদিন কাটাইয়া অপরাহ্ন চারটার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিত। তাহার পিতামাতা মনে করিত ছেলে স্কুল হইতেই আসিল।

এই ভাবে তিন বৎসর স্কুলে কাটাইয়া হরিশ বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। ঐটুকু বিদ্যাতেই রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করা আট্‌কায় না। তাই সে মধ্যে মধ্যে মায়ের বিশেষ অনুরোধে যখন সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িত, তখন নন্দকুমার ও তাহার গৃহিণীর আনন্দের আর সীমা থাকিত না। তাহারা মনে করিত, আর কিছুদিন পরেই কোম্পানীর লোকেরা হরিশকে বাটী হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া দারোগাগিরি না দিউক, অন্ততঃ জেলার একটা হাকিমের পদে বসাইয়া দিবে। এ আনন্দের আতিশয্যে তাহারা হরিশ যখন যাহা চাহিত তাহাই দিত; সুতরাং হরিশের পয়সাকড়ির অভাব হইত না।

এ অবস্থায় যাহা ফল হয়, হরিশের ভাগ্যে তাহাই হইল। সে বোধোদয়ের ক্লাশ হইতে উপর ক্লাশে প্রমোশন পাইল না বটে, কিন্তু তামাকের ক্লাশ হইতে গাঁজার ক্লাশে প্রমোশন্ পাইবার সময় সে সর্ব্বোচ্চ নম্বরই পাইয়াছিল।

হরিশ কিন্তু একটী বিদ্যা শিখিয়াছিল; সে বেশ সুন্দর গান

করিতে পারিত। তাহাদের গ্রামের চারিদিকে তিন চার ক্রোশের মধ্যে যেখানে যাত্রা বা কীর্ত্তন হইত, হরিশ সেখানেই যাইত এবং এমন নিবিষ্ট চিত্তে সে গান শুনিত যে, অনেকগুলি গান আয়ত্ত করিয়া সে বাড়ীতে ফিরিত। হরিশের চেহারাও মন্দ ছিল না।

হরিশের বয়স যখন পনর বৎসর, সেই সময় কেশবপুরের অধিবাসীরা চাঁদা করিয়া বারোয়ারী-পূজার অনুষ্ঠান করে, এবং বারোয়ারীর দলের পাণ্ডারা রাষ্ট্র করিয়া দেয় যে তাহারা কলিকাতার যাত্রার দল বায়না করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহারা বর্দ্ধমানের এক শিয়াল-তাড়ান যাত্রার দল আপ্‌খোরাকী পঁয়তাল্লিশ টাকায় বায়না করিয়াছিল।

"শিয়াল তাড়ান" কথাটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। কোন পূজা উপলক্ষে সমস্ত রাত্রি যদি পূজা-মণ্ডপের সম্মুখে আসরে গানবাজনা অথবা লোকসমারোহ না হয়, তাহা হইলে সেখানে রাত্রিকালে শিয়াল-কুকুরে আসর জমাইয়া থাকে। এইজন্য অনেক স্থলে যাত্রার দলের ভাল-মন্দের বিচার না করিয়া সারা রাত্রি আসর রক্ষা করিবার জন্য গানের দল লইয়া আসে। এই প্রকার যাত্রার দলকেই "শিয়াল-তাড়ান" যাত্রা বলে।

কেশবপুরের বারোয়ারীতে যে যাত্রার দল আসিয়াছিল, তাহারা গান শেষ করিয়া যখন বাসাবাড়ীতে বিশ্রাম করিতেছিল, সেই সময় হরিশ সেই বাড়ীর সম্মুখ দিয়া তাহাদেরই পালার একটি গান গাইতে গাইতে যাইতেছিল। যাত্রার দলের অধিকারী মহাশয় তখন ঘটি হাতে করিয়া মাঠের দিকে যাইতেছিল।

হরিশের সুকণ্ঠ-নিঃসৃত গান শুনিয়া অধিকারী তাহাকে নিকটে ডাকিয়া আনিল। তাহার পরিচয় লইয়া এবং তাহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া অধিকারী হরিশকে বলিল, "ওহে ছোক্‌রা, তুমি আমার যাত্রার দলে থাকবে? এখন মাসে তিন টাকা মাহিয়ানা দিব, আর খাওয়া-দাওয়া ত আছেই; ক্রমে আরও বাড়াইয়া দিব।"

অধিকারীর এই প্রস্তাবে হরিশ তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিল এবং সেই দিন অপরাহ্নেই পিতামাতাকে কোন সংবাদ না দিয়া যাত্রার দলের সহিত চলিয়া গেল।

এদিকে সন্ধ্যার সময় হরিশ যখন বাড়ী ফিরিল না, তখন তাহার পিতামাতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নন্দকুমার পুত্রের অনুসন্ধানে সেই রাত্রেই কেশবপুরে গমন করিল; কিন্তু সে গ্রামের কেহই কোন বার্ত্তাই দিতে পারিল না। রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন নন্দ-কুমার পুনরায় পুত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইল। এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরিয়া অবশেষে একজনের নিকট সংবাদ পাইল যে, তাহার পুত্র কলিকাতার যাত্রার দলের সহিত চলিয়া গিয়াছে।

নন্দকুমার একবার কেশবপুরের এক বাবুর সহিত কলিকাতায় গিয়াছিল। কলিকাতা যে কত বড় সহর, তাহা সে জানিত। সে সহর হইতে তাহার পুত্রকে খুজিয়া বাহির করা যে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার, নন্দকুমার সে কথা বুঝিল। তাহার গৃহিণী ঐ সংবাদ পাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। গ্রামের দশজন বলিল, "যাত্রার দলের চাকরী, সে ত বড় চাকরী; এতে আর দুঃখ করা কেন? হরিশ নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিবে।"

নন্দকুমারের হৃদয় এ প্রবোধে আশ্বস্ত হইল না। বিদেশে পরের কাছে ছেলের কত কষ্ট হইবে, এই ভাবনায় নন্দকুমার কাতর হইয়া পড়িল। তাহার পর তিন দিনের জ্বরেই তাহার দেহাবসান হইল। হরিশ এ সংবাদও পাইল না।

সাত মাস পরে একদিন হরিশ বাড়ী আসিল। এতদিন তাহার মাতা কোন প্রকারে জীবনধারণ করিয়াছিল। এতদিন পরে পুত্রকে দেখিয়া নন্দকুমারের স্ত্রী আকাশের চাঁদ হাতে পাইল; তাহার স্বামীশোক কথঞ্চিৎ নিবারিত হইল।

হরিশ যাত্রার দলে যাহা বেতন পাইত, তাহাতে তাহার গাঁজার খরচই কুলাইত না; সুতরাং সে রিক্ত হস্তেই বাড়ীতে আসিয়াছিল। এই সাত মাসে তাহার মতিগতিও অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছিল। চাষের কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব; অথচ গৃহেও অন্নাভাব। নন্দকুমারের মৃত্যুর পর হরিশের মাতা তাহার জমি প্রতিবেশী একজনকে ভাগে বিলি করিয়াছিল। তাহারা দয়া করিয়া যাহা দিত, তাহাতেই কোন রকমে এতদিন চলিয়াছে।

হরিশের মাতা এখন পুত্রকে বলিল, "বাবা, তোর আর চাকরী করে কাজ নেই। জমি ছাড়িয়ে নিয়ে নিজে চাষ কর, আমাদের কুলিয়ে যাবে।"

হরিশ মাতার এ পরামর্শ কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিল না; আবার কোন যাত্রার দলে প্রবেশ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু এ সুযোগ কি সর্ব্বদাই উপস্থিত হয়?

মাস দুই অপেক্ষা করিয়াও যখন সে কোন যাত্রার দলের

সন্ধান পাইল না, তখন একদিন মাতার অজ্ঞাতসারে সে গৃহ ত্যাগ করিল এবং বর্দ্ধমান জেলার মানকর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে একবার যাত্রার দলের সহিত মানকরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ মহাশয়দিগের বাড়ীতে গান করিতে গিয়াছিল। এবারও মানকরে আসিয়া সে সেই কবিরাজ-বাড়ীতেই আশ্রয় লইল। সেই সময়ে কলিকাতার একজন মহাজন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে রোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য মানকরে গিয়াছিলেন। হরিশ তাঁহার নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইলে তিনি হরিশকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। এই ভদ্রলোকই আমাদের পূর্ব্বকথিত আড়তের কর্ত্তা লক্ষ্মী বাবু।

সেই হইতেই হরিশ আজ ৩৫ বৎসর বাবুদের আড়তেই আছে। প্রথমে সে বাবুদের সামান্য ফরমাইস্ খাটিত, তাহার পর কিছুদিন আড়তের ভাণ্ডারীর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরিত, শেষে একেবারে পাকা ভাণ্ডারীর পদে বাহাল হইয়া এই সুদীর্ঘকাল সেই কার্য্যই করিয়া আসিতেছে।

আড়তের চাকুরী প্রাপ্তির তিন বছর পরেই হরিশের বিবাহ হয়। তাহার পাঁচটী সন্তান হয়; তাহার মধ্যে চারিটী বাল্যাবস্থায় মারা যায়, কেবল একটি মেয়ে বাঁচিয়া আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার মাতা পরলোকগত হয় এবং মেয়ের বিবাহের পরেই তাহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। এখন সংসারে ঐ কন্যাটী ব্যতীত তাহার আর কেহই নাই।

হরিশ যখন প্রথম আড়তে আসে, তখন সে মদ-গাঁজা খাইত;

কিন্তু কিছুদিন পরেই সে মদ গাঁজা দুই-ই ছাড়িয়া দেয়; সে আজ প্রায় ২০ বৎসরের কথা।

কলিকাতার আড়তের ভাণ্ডারীদের যথেষ্ট পাওনা আছে—বেশ দু'পয়সা উপরি আছে। যুবক হরিশ বিবাহিত হইলেও হাতে কাঁচা পয়সা পাইয়া কুপথগামী হয়। সেই সময় শ্রীমতী দুর্গা তাহার স্কন্ধে ভর করে। হরিশ তাহাকে মাসে-মাসে যথেষ্ট সাহায্য করিত; আড়তের সকলেই, এমন কি কর্ত্তারাও এ কথা জানিতেন, কিন্তু কেহই তাহার জন্য হরিশের নিন্দা করিত না; কারণ আড়ত-অঞ্চলে যে সমস্ত কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকের সম্বন্ধেই এ প্রকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

যতদিন হরিশের স্ত্রী জীবিতা ছিল, ততদিন কলিকাতায় হরিশের এই উপসর্গটী ছিল। তাহার পর যখন তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হইল, তখন, কি জানি কেন, তাঁহার ভাবান্তর লক্ষিত হইল। সে তখন অতিশয় সংযত-চরিত্র হইল; কিন্তু শ্রীমতী দুর্গাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় ত্যাগ করিতে পারিল না; এ সময়ে সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটীকে ত্যাগ করা তাহার নিকট অধর্ম্ম বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাই সে প্রতি মাসে দুর্গাকে খরচের টাকা দিয়া আসিতেছে।

হরিশের এখন আর কোন বদ্‌খেয়াল নাই; সংসারের বন্ধন কেবল মেয়েটী। এমন সময় সে এক পরের ছেলের ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিল এবং তাহার শিক্ষা-বিধানের জন্য মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইল; সকল বন্ধন হইতে মুক্তি

লাভ করিয়াও আবার সে বন্ধনে জড়াইয়া পড়িল—তাহার 'ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত' এই একটা অবলম্বন পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

[৯]

হরিশ পরের চাকরী করে, বিশেষতঃ সে অত বড় একটা আড়তের ভাণ্ডারী, সে কি আর যখন-তখন আড়ত ছাড়িয়া যাইতে পারে। আড়তের দ্বিপ্রহরের আহারাদি শেষ হইতে অপরাহ্ণ দুইটা আড়াইটা বাজিয়া যায়, তাহার পর সে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম পায়। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ত আর পরেশের সমস্ত আবশ্যক-দ্রব্য কেনা যায় না। সে তাই পরেশকে বলিল "দেখ পরেশ, তুমি যে মেসে থাকবে, সেই মেসের ঐ যে ছেলেটী—তার নামটা যেন কি মনে হচ্চে না—তাকে বল্‌লে সে কি তোমার সব জিনিষ কিনে দেবে না?"

পরেশ বলিল "কেন কাকা, অমর বাবু ত সে দিন তোমার সাক্ষাতেই বলেছিল যে, আমার যা যা দরকার, সে সব কিনে দেবে। দেখ কাকা, ঐ ছেলেটী বেশ ভাল; অহঙ্কার মোটেই নেই।"

হরিশ বলিল "তা হ'লে কখন সেখানে যাওয়া যায় বল ত? তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আমি চট্ করে ঘুরে আস্‌তে পারি।

পরেশ বলিল "আজ ত তা হলে তোমার যাওয়া হয় না, কাকা। কি জানি, আজ যদি অমর বাবু কলেজ থেকেই আর কোথাও যায়। আমাদের প্রায় প্রত্যহই আড়াইটায় ছুটী হয়।

আমি আজ অমর বাবুকে বল্‌ব, সে যে দিন যেতে বল্‌বে, সেই দিন গেলেই হবে।"

হরিশ বলিল "এ সব কাজে দেরী করতে নেই। তুমি তাঁকে বোলো কাল তিনটের পরই আমি গিয়ে টাকা দিয়ে আসব ; তিনি যেন সেই সময় বাসায় থাকেন।"

পরেশ বলিল "আচ্ছা, আজই কলেজে তাকে বল্‌ব। সে কি বলে, তা তোমাকে এসে বল্‌ব। দেখ কাকা, তুমি মেসে রাখ্‌বার জন্য এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছ কেন ?"

হরিশ বলিল "ব্যস্ত নয় বাবা ! বলা ত যায় না, কখন কি হয়। আর এক কথা, এরা তোমার গাঁয়ের লোক, বড়মানুষ ; এরা যখন দুটা ভাত দিতেও এত কাতর, তখন এদের আশ্রয় ছেড়ে যত শীঘ্র তুমি যাও, সেই ভাল। টাকা-কড়ি ধন-দৌলত কি সঙ্গে যাবে বাবা !"

পরেশ বলিল "সকলেই কি আর তোমার মত, তা হলে যে এ পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যেত। এই দেখ না, আমার বাবা আছেন, বিমাতা আছেন, গ্রামেও দশজন লোক আছেন ; কিন্তু কৈ, কেউ ত আমার মুখের দিকে চাইলেন না ; আর তোমার সঙ্গে এই ত কয় দিন দেখা ; তুমি আমাকে চিন্‌তে না, শুন্‌তে না ; আমি সত্য বল্‌ছি, কি মিথ্যা বল্‌ছি, তা একবার ভাবলেও না। তুমি কি না তোমার এই কষ্টের উপার্জ্জন আমার জন্য খরচ করতে দাঁড়িয়েছ। আমি তোমার—"

পরেশের কথায় বাধা দিয়া হরিশ বলিল "ও কথা বোলো না বাবা ! আমি মহাপাপী। আর রোজগার কি আমি করি।

ও সব ভুল কথা। যাঁর রোজগার তিনি করেন, যাঁর খরচ তিনি করেন ,মানুষ উপলক্ষ মাত্র। সেই গানটা জান না পরেশ—'তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা! লোকে বলে করি আমি।' এই কথাটা খুব ভাল করে মনে বেঁধে রেখ বাবা! কোনও দিন ভুলে যেও না যে, তাঁর কর্ম্ম তিনি করছেন। আমি কোথাকার কে? আমি কি খরচ করবার মালিক? যাক্ সে কথা, তুমি আজ সেই বাবুর সঙ্গে কথা ঠিক করে আস্‌তে ভুলো না বাবা! দেখ, আর এক কাজ কোরো। আমি আজ সকালে যখন বাজার আন্‌তে গিয়েছিলাম, তখন দুর্গার বাড়ীতে একটু দাঁড়িয়ে গিয়াছিলাম। সে বার বার ব'লে দিয়েছে, তুমি যেন কলেজ থেকে ফিরিবার সময় তার বাড়ীতে যেও। সে যে তোমাকে কি চক্ষেই দেখেছে! যাবে ত? ওতে দোষ নেই। বাড়ীটা খারাপ বটে, আর-আর ভাড়াটেরা বদ্ মেয়েমানুষ; তাতে তোমার কি? কি বল?"

পরেশ বলিল "কাকা, যারা বদ্, তাদের সঙ্গে আমার কি? কিন্তু তুমি যার কাছে আমাকে কা'ল নিয়ে গিয়েছিলে, সে বদ্ হোতেই পারে না; সে কিছুতেই বেশ্যা নয়। আমি বুঝি আর বেশ্যা দেখি নাই। তাদের দেখলেই ভয় হয়। কিন্তু ওকে দেখলে ত ভক্তি হয়। আচ্ছা কাকা, ওকে আমি কি ব'লে ডাকবো। মায়ের মত মানুষ, তাকে ত আর নাম ধরে ডাকা যায় না।"

হরিশ বলিল "দুর্গাকে তুমি মাসী ব'লে ডেকো। তা হ'লে তুমি কলেজ-ফেরত তার সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌বে।"

পরেশ বলিল "আমি ত কালই সে কথা স্বীকার ক'রে

এসেছি। দেখ কাকা, মাসী যদি আমাকে কিছু খেতে দেয়, তা খাব। তাতে ত কোন দোষ হবে না?"

হরিশ বলিল "দোষ কিসের! দুর্গা এক সময়ে বেশ্যা ছিল বটে, কিন্তু এখন ত আর তার সে ভাব নেই। আরও দেখ, সে তোমাকে সন্তানের মত দেখে; মায়ের হাতে খাবে, তাতে আর দোষ কি? জান না, আমার দয়াল চৈতন্য সকলকেই কোল দিতেন; যে হরিনাম করেছে, তাকেই তিনি প্রেম বিলিয়েছেন। তাঁর নাম নিলে কি আর পাপ থাকে, সব খাঁটি হয়ে যায়। তুমি দুদিন গেলেই দেখ্‌বে যে, দুর্গা এখন আর সে দুর্গা নেই। মানুষের কত ভুল হয়। আমরা কত ভুল করেছি, কত পাপ করেছি, তাই বলেই কি তুমি আমাদের ঘৃণা করতে পার। দেখ, প্রভু বলেছেন, পাপকে ঘৃণা করো, কি পাপীকে ঘৃণা করো না। তাই ত প্রভু আমার অধমতারণ। তুমিও বাবা, আমার প্রভুর মত অধমতারণ হোয়ো। তা হলেই তোমার লেখাপড়া সার্থক হবে, তোমার জন্ম সার্থক হবে। অনেক তপস্যা ক'রে জীব এই দুর্লভ মানবজন্ম পায়। এমন জনম আর হবে না। পশুর মত এ জনম হারায়ো না। তুমি পারবে বাবা, তুমি তা পারবে। তোমাকে প্রথম দেখেই আমি বুঝেছি, তোমার উপর প্রভুর কৃপা আছে। এই দেখ না, কল্‌কাতা সহরে ত আমি কম দিন আসি নি। এত দিনের মধ্যে কত লোক দেখ্‌লাম; তোমার মত ছেলে কত দেখেছি। কৈ, কারও উপর আমার এত টান হয় নাই। টান কি আপনি হয় বাবা! যাঁর টান, তিনি না টান্‌লে মানুষের সাধ্য কি! তোমার মুখখানি দেখেই বোধ হোলো—প্রভু ব'লে

দিলেন—তুমি খাঁটি ছেলে, তুমি প্রভুর দাস হবে। তাই ত প্রভু তোমাকে সাহায্য করছেন। সবই প্রভুর ইচ্ছা।"

পরেশ অবাক্ হইয়া হরিশের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, বক্তা একটা আড়তের সামান্য ভৃত্য—ভাণ্ডারী মাত্র। সামান্য নিরক্ষর ভাণ্ডারীর মুখ দিয়া কি এমন কথা বাহির হয়। আর কি তাহার ভক্তি! কি তাহার মুখের ভাব! পরেশ অবাক্ হইয়া কথা শুনিতেছিল। হরিশ যখন চুপ করিল, তখন পরেশ বলিল "হরিশ কাকা, তুমি মানুষ, না—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া হরিশ বলিল "না বাবা, আমি মানুষ না, আমি পশু। এ পশুকে একটু মানুষের দিকে নিয়ে যাবার জন্য প্রভু তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তুমি কি আপনি এখানে এসেছ বাপধন! তা মনেও কোরো না। সব সেই প্রভুর খেলা। তা সে কথা যাক্, এখন বেলা হয়ে গেল; তুমি স্নান-আহার করে কলেজে যাও। আজ আর তোমার জন্য জলখাবার এনে রাখ্‌ব না বাবা! দুর্গা সেই জন্যই তোমাকে ডেকেছে; তা আমি তার কথার ভাবেই বুঝতে পেরেছি।"

পরেশ বলিল "কাকা, তুমি এমন ক'রে বৃথা পয়সা খরচ কর কেন? আমি গরীবের ছেলে, আমি মাতৃহীন; আমি কি কোন দিন মিঠাই দিয়ে জল খেয়েচি। কালেভদ্রে কারও বাড়ী নিমন্ত্রণে গেলে লুচি সন্দেশের মুখ দেখেছি। আর তুমি কি না আমার জন্যে রোজ বিকালে জলখাবার এনে রাখ। এ সব কোরো না হরিশ কাকা! আমার যদি কোনও দিন ক্ষিদে পায়, তা হ'লে

তোমার কাছে থেকে একটা পয়সা চেয়ে নিয়ে আমি মুড়ি কিনে এনে খাব। বাড়ীতে আমি তাই ত খেতাম—আবার সেই মুড়িও সকল দিন জুটতো না, তা জান?"

হরিশ বলিল "সে আমার আর জেনে কাজ নেই। তুমি এখন কলেজে যাওয়ার চেষ্টা দেখ।" এই বলিয়া সে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। পরেশ বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কোথাকার কে এই হরিশ ভাণ্ডারী তাহার এ কি মহত্ব, তাহার এ কি স্নেহ! পরেশের চক্ষে জল আসিল।

[১০]

পরেশ আহারাদি শেষ করিয়া যথাসময়ে কলেজে গেল। অমর কলেজে আসিয়াই পরেশকে জিজ্ঞাসা করিল "কি পরেশ, কবে তুমি আমাদের মেসে আসছ?"

পরেশ বলিল "যে দিন তুমি আমার জিনিসপত্র কিনে দেবে, তার পরদিনই আসব।"

অমর বলিল "বেশ ত, আজই চল না, সব কিনে নিয়ে আসিগে।"

পরেশ বলিল "কাকা ত আজই টাকা নিয়ে আসতে চেয়েছিল; কিন্তু আমি তাকে আজ আসতে নিষেধ করলাম; কি জানি, আজ যদি তোমার কোন কাজ থাকে। কাকাকে বলে এসেছি, তুমি যে দিন আসতে বলবে, সেই দিন কাকা এসে তোমার কাছে টাকা দিয়ে যাবে। কাকা ত আর সঙ্গে যেতে পারবে না। তোমাকে ভাই, আমার সব জিনিস কিনে দিতে হবে।"

অমর বলিল "তাতে আর কি। তুই ঘণ্টার মধ্যে সব জিনিস

কিনে আন্‌ব। আর তোমার কাকা যদি সঙ্গেই না যেতে পারে, তবে তার কষ্ট করে আসবারই বা দরকার কি, তুমি টাকা নিয়ে এলেই হবে।"

পরেশ বলিল "আমি কাকাকে সে কথা বলেছিলাম; কাকা বল্‌লে যে, সে নিজে ভাল করে বলে যাবে।"

অমর বলিল "বেশ, তা হলে কা'লই তোমার কাকাকে আস্‌তে বোলো। তিনটের সময় এলেই হবে। টাকা নিয়েই আমরা বাজারে বেরিয়ে যাব, সন্ধ্যার আগেই সব জিনিস কিনে ফিরব। তার পর পরসু দিন থেকে তুমি এস।"

আড়াইটার সময় কলেজ বন্ধ হইলে পরেশ আড়তে না যাইয়া একেবারে দুর্গার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। হরিশ দুর্গাকে বলিয়া আসিয়াছিল যে, পরেশ যদি আসে, তবে দুইটার পর তিনটার মধ্যেই আসিবে। দুর্গা তাই পরেশের অপেক্ষায় দুইটার পর হইতেই দ্বারের নিকট বসিয়া ছিল। পরেশকে আসিতে দেখিয়াই দুর্গা বলিল "এস বাবা এস; আমি এই এক ঘণ্টা তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।"

পরেশ বলিল "মাসী, আমাদের কলেজ আড়াইটায় বন্ধ হয়; কলেজ থেকে বরাবর আমি এখানে আসছি; পথে একটুও দেরী করি নি।"

দুর্গা বলিল "কৈ তোমার ছাতা কৈ?"

পরেশ বলিল "আমার ছাতা নেই।"

"ছাতা নেই! তা সে ভাণ্ডারীর পোর কি চোকও নেই! এই রোদের মধ্যে ছেলেটা খালি মাথায় পড়তে যায়, আর সে

তার খবরও রাখে না। ও মানুষটা ঐ এক রকমের। এস বাবা, আহা! বড় কষ্ট হয় তোমার! যাক্, কালই তুমি একটা ছাতা কিনে নিও।" এই বলিয়া দুর্গা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, পরেশ তাহার অনুসরণ করিল।

দুর্গা পরেশকে বলিল "বাবা, একটু বিশ্রাম কর। এতখানি পথ কি ছেলেমানুষ হাঁটিতে পারে—আর এই দুপুর রোদের মধ্যে। মুখখানি যে লাল হয়ে গিয়েছে।" এই বলিয়া দুর্গা একখানি পাখা লইয়া পরেশকে বাতাস করিতে আসিল। পরেশ দুর্গার হাত হইতে পাখাখানি লইয়া বলিল "মাসী, আমার মোটেই কষ্ট হয় না; ছেলেবেলা থেকে কষ্ট পেয়েছি, আমার সব সয়ে গিয়েছে।"

দুর্গা বলিল "আহা, অমন কথা বোলো না বাবা!"

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পরেশ হাতমুখ ধুইয়া লইল। দুর্গা খানিকটা আগেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সে একখানি থালাতে খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পরেশ এই আয়োজন দেখিয়া বলিল "মাসী তুমি এ কি করেছ। আমার জন্য এত খাবার কেন? আমি ত এ সব খেতে ভালবাসি না, আমি মুড়ি খাই।"

দুর্গা বলিল "সে আমি বুঝে নেব, তুমি কি খাও না খাও। এখন এইগুলো খাও ত। এ আর বেশীই বা কি! তুমি ত আর এ পাড়ায় থাক্‌বে না যে, রোজ ডেকে খাওয়াব। আমি কত করে বল্‌লাম, যে তুমি আমার কাছে থাক। তা' তোমার কাকার মত হয় না। সে বলে ছেলেদের সঙ্গে থাক্‌লেই তোমার পড়া ভাল হবে। তা, সে কথাও সত্যি! দেখ এ পাড়ায় যদি

থাক্‌তে, তা হ'লে তোমাকে রোজ আস্‌বার কথা বল্‌তাম। তা যখন হোলো না, তখন হপ্তায় দুদিন তিনদিন এখানে তোমাকে আস্‌তেই হবে বাবা! আমার কাছে স্বীকার করে যাও।"

পরেশ কি করে, তাহাই স্বীকার করিল। আহার হইয়া গেলে, পরেশ যখন বিদায় লইবে, সেই সময় দুর্গা কুড়িটি টাকা দিতে আসিল। পরেশ বলিল "টাকা কি হবে মাসি! আমার ত টাকার দরকার নেই।"

দুর্গা বলিল "বাক্সে তুলে রেখে দিও, যখন দরকার হবে তখন খরচ করো।"

পরেশ বলিল "যখন দরকার হবে, তখন নিয়ে গেলেই হবে। কাকা ত আমাকে বলেই দিয়েছে যে, যখন যা দরকার হবে, তোমার কাছ থেকেই চেয়ে নিতে।"

"দরকার হ'লে ছুটে আস্‌বার চাইতে, এখনই নিয়ে রাখ না বাবা!" এই বলিয়া জোর করিয়া পরেশের হাতের মধ্যে দুর্গা টাকা দিল। পরেশ কি করিবে, টাকা লইয়া আড়তে চলিয়া আসিল।

[১১]

পরেশ বাসায় আসিয়াই হরিশের হাতে কুড়ি টাকা দিতে গেল। হরিশ বলিল "এ টাকা কোথায় পেলে বাবা?"

পরেশ কহিল "আমি কিছুতেই নেব না, মাসীও ছাড়বে না; সে জোর ক'রে আমার হাতে টাকা দিল। আমি এত ক'রে বললাম যে, আমার এখন টাকার দরকার নেই, দরকার হলেই চেয়ে নেব। সে কিছুতেই শুন্‌লো না কাকা! আমি কি ক'রব,

নিয়ে এলাম। দেখ কাকা, এ কুড়ি টাকাতেই আমার জিনিস-পত্র কেনা হয়ে যাবে—অত-ও লাগ্‌বে না; কেমন কাকা!”

হরিশ বলিল “পাগল আর কি! কুড়ি টাকায় কি হবে? সব জিনিসই ত কিন্‌তে হবে।”

পরেশ বলিল “সব জিনিস আর কি। বিছানার কথা বলছ? তা আমাকে একটা মাদুর আর ছোট দেখে একটা বালিশ কিনে দিও। বালিশ না হলেও হয়; আমি খালি মাথাতেই শুতে পারি; তাতে আমার মোটেই কষ্ট হয় না। আর কি লাগবে? রাত্রিতে পড়বার জন্য একটা প্রদীপ, একটা মাটীর দেরকো, আর এক বোতল তেল। তবে, খান-তিনেক বই কিন্‌তে হবে; তাতেই যা লাগে; সে বেশী নয়—এই আট নয় টাকা। আর আবার কি কিন্‌তে হবে? এগুলিতে বড় বেশী হ'লে তের চোদ্দ টাকা-তেই হবে; তা হ'লে ত ছয় সাত টাকা এর থেকেই বাঁচবে। তুমি বলছ, এতে হবে না।”

হরিশ হাসিয়া বলিল “ওরে বাবা, তুমি চুপ কর; যা যা লাগবে, আমি সেই বাবুটীকে ব'লে আস্‌বো; আর সে নিজেই তা ব'লে দেবে। ভাল কথা, তুমি তাকে বলেছিলে?”

পরেশ বলিল, “হাঁ, কাল তিনটের সময় যেতে বলেছে। সে ত বল্‌ল, তোমার আর কষ্ট করে যাবার দরকার কি? আমরাই কিন্‌তে পারব। শেষে আমি যখন বললাম যে, তুমি ভাল ক'রে ব'লে আস্‌বে, তখন তোমাকে যেতে বল্‌ল। আমরা কলেজের বাহিরেই তোমার জন্য তিনটের সময় দাঁড়িয়ে থাক্‌ব; তুমি যদি বাসা না চিন্‌তে পার।”

হরিশ বলিল "আজ ত্রিশ বছর কল্‌কাতায় কাটালাম, আর আমি চিন্‌তে পারব না। তা বেশ, তোমরা কলেজের বাইরেই দাঁড়িয়ে থেক; আমি আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে ঠিক যাব।"

পরেশ বলিল, "আচ্ছা কাকা, তুমি যে বলছ কুড়ি টাকায় হবে না, আমি সেই কথাটা বুঝতে পারছি নে; কুড়ি টাকা কি কম টাকা!"

হরিশ বলিল "তুমি বুঝি মনে করেছ, একটা মাদুর আর একটা বালিশ, আর এক বোতল তেল হ'লেই সব হ'য়ে যাবে? তা কি হয়! কাপড়-চোপড় নেই বললেই হয়; পায়ে ঐ ছেঁড়া চটি; জামা যা আছে, তা একেবারে ছেঁড়া; একটা ছাতা পর্য্যন্তও নেই। এ সকল কিন্‌তে হবে। তারপর—"

হরিশের কথায় বাধা দিয়া পরেশ বলিল "কাকা, ও সব আমার কিছুই দরকার নেই—কিচ্ছু না। তুমি কি মনে করেছ কাকা? তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি বড় গরীব, আমি দুবেলা দুমুঠো খেতে পেলে বেঁচে যাই। আমার এত কাপড়-চোপড়, এত জুতা-জামা ছাতার কোন দরকার নেই। আমি ত কোন দিন এ সব ব্যবহার করি নাই। এই যে চটি জুতো দেখছ, এ আমার নয়। আমি যখন পরীক্ষা দিতে যাই, তখন বাবা তাঁর এই পুরাণো জুতাজোড়া আমাকে দিয়েছিলেন, তার আগে যে আমি কোনদিন জুতো পায়েই দিই নাই। তুমি এ সব কিনে টাকা নষ্ট কোরো না। আমি বড় গরিব কাকা! আর তুমিও বড়মানুষ নও; তুমি এই আড়তে ভাণ্ডারীর কাজ করে কতই বা পাও। তার পর

তোমার মেয়ে আছে, ঘরসংসার আছে। তুমি এত টাকা কেন খরচ করবে? না কাকা, আমি ও-সব কিছুই চাইনে। আমার যা কাপড়-জামা আছে, তাতেই বেশ চলে যাবে।”

হরিশ বলিল “বাবা, যখন চলেছিল, তখন চলেছিল। এখন কলিকাতায় এসেছ, কলেজে পড়, দশজন ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে থাকতে হবে; এখন ও-সবে চলবে না। এখানে ভাল কাপড়-চোপড় চাই, জুতা-জামা চাই। তুমি আগের সব কথা মনে কোরো না। চিরদিন কি মানুষের সমান যায়। তুমি একটা পাশ দিয়েছ; প্রভুর ইচ্ছায় আরও পাশ দেবে; এখন আর দশজন ছেলে যেমন থাকে, তোমাকেও তেমনি থাকতে হবে। আমি যা হোক কিছু রোজগার করি, তোমার মত একটা ছেলেকে ভদ্র-লোকের মত রাখবার ক্ষমতা আমার আছে। তুমি কোন কথা বোলো না; আমি যা করি তাই দেখ।”

পরেশ বলিল “তা যেন দেখলাম কাকা; কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না যে, আমি কে? এ সব ব্যবহার করতে শিখলে কি শেষে ছাড়তে পারব। এ সব যতই বাড়ান যায়, ততই বাড়ে। আমি বিলাসিতা মোটেই ভালবাসি নে। মেসে থাকতে গেলে যদি এই সব দরকার হয়, তা হলে কাকা, আমি মেসে যাব না, আমি কলেজেও পড়বো না। তুমি যে আমাকে বাবু করতে চাও কাকা! আমি গরিব মানুষের ছেলে, গরিবের মতই থাকতে চাই; তাতে কেউ আমাকে ঘৃণা করে করুক না।”

হরিশ বলি “বাবা, বলেছি ত, কলকাতায় থাকতে গেলে, কলেজে পড়তে গেলে, একটু ভদ্রলোকের মতই [illegible]

এর নাম বাবুগিরি নয়—এ সব দরকার। যাক্, তোমার সঙ্গে আর এ নিয়ে তর্ক কর্'ব না, আমি যা ভাল বুঝি তাই করব।"

পরেশ বলিল "আচ্ছা কাপড়-জামার কথা ত শুন্লাম; তারপর আর কি কিন্‌তে হবে।"

হরিশ বলিল "সে আমি জানিনে বাপু! কাল ত সেই ছেলে-টার কাছে যাচ্ছ; সে যা যা বল্‌বে তাই আমি কিনে দেব; তোমার কোন কথা শুনব না।" এই বলিয়া হরিশ কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

পরদিন ঠিক আড়াইটার সময় অমর ও পরেশ কলেজ হইতে বাহির হইয়াই দেখে, রাস্তার পার্শ্বে হরিশ দাঁড়াইয়া আছে। পরেশ তাড়াতাড়ি তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাকা, তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?"

হরিশ বলিল "বেশীক্ষণ নয়, এই দশ-পনর মিনিট। এখন চল, তোমাদের বাসায় যাই। সেখানে ব'সে ফর্দ্দ মত টাকা দিয়ে আমি আড়তে ফিরে যাব।"

অমর বলিল "তুমি না এলেও পারতে, পরেশের হাতে টাকা পাঠিয়ে দিলেই হ'ত, আমরা দুইজনে কিনে আন্‌তাম।"

হরিশ বলিল "তোমরা কি কি কিন্‌বে, তা শুনলে, পরে আমিও দুইচারটা জিনিষের কথা বল্‌তে পারব, তাই আমি এসেছি।"

তাহার পর তিনজনে অমরদের বাসায় উপস্থিত হইল। অমর বলিল "আমি বন্দোবস্ত করেছি, আমি আর পরেশ দুইজনে আমাদের এই ঘরে থাক্‌ব। কেমন পরেশ, সে ভাল হবে না?"

পরেশ বলিল "তা হ'লে ত খুবই ভাল হয়; কিন্তু তাতে তোমার ত কোন অসুবিধা হবে না?"

অমর বলিল "অসুবিধা কি, আমার আরও সুবিধা হবে; দুইজনে এক-সঙ্গে থাকব, এক-সঙ্গে পড়ব; তাতে আমাদের দুইজনেরই ভাল হবে। সে কথা থাক্, এখন তুমি হাতে-মুখে জল দাও। ঝিকে দিয়ে দোকান থেকে খাবার আনাই। এরই মধ্যে আমাদের ফর্দ্দ ঠিক করা হয়ে যাবে।"

পরেশ বলিল "ভাই, আমাদের জন্য খাবার আন্‌তে হবে না; তোমার নিজের মত আনাও।"

অমর হাসিয়া বলিল "সে পরামর্শ তোমার কাছে নিতে এখনও ঢের দেরী আছে।" এই বলিয়া অমর বাহিরে চলিয়া গেল, একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "এখন তা হ'লে সব ঠিক করি।"

হরিশ বলিল, "তাই কর বাবা! আমি বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারব না।"

তখন অমর ফর্দ্দ করিতে বসিল এবং নিজের মনেই কতকগুলি জিনিষের নাম লিখিল। তারপর হরিশের দিকে চাহিয়া বলিল "আমার যা যা মনে এল, তা সব লিখেছি, এখন পড়ি শোন।" এই বলিয়া সে পড়িতে আরম্ভ করিল।

খানিকটা পড়া হইলে, বাধা দিয়া পরেশ বলিল "ভাই, তুমি ও কি করছ; ওর কিছুই যে আমার দরকার হবে না।"

হরিশ বলিল "ওর কথা শুনো না বাবা, তুমি পড়।" অমর ফর্দ্দ পড়িয়া শেষ করিলে, হরিশ বলিল "ঠিক হয়েছে, আমার

আর কিছুই মনে পড়ছে না; আর আমি কি অত জানি! এখন কত টাকা লাগবে, তাই বল।”

অমর বলিল “তুমি কত টাকা এনেছ?”

হরিশ বলিল “পঞ্চাশ টাকা।”

“পঞ্চাশ টাকা! কাকা, তুমি বল কি? পঞ্চাশ টাকা! আমার যা মোটেই দরকার নেই, তার জন্য তুমি পঞ্চাশ টাকা দেবে?”

হরিশ বলিল “আরও যদি লাগে, তাও দেব।”

পরেশ বলিল “হরিশ কাকা, তুমি কি পাগল হয়েছ? এত টাকা তুমি খরচ করবে! তুমি যে ভুলেই গেলে, আমি বড় গরিব। ভাই অমর, তুমি ও কি করছ। আমাকে কোন রকমে এই মেসে একটু স্থান দিও, আমি কষ্ট পেতে ভয় পাই নে। অত জিনিষ আমি কি করব।’

হরিশ হাসিয়া বলিল “অমরবাবু, বুঝেছ বাবা, আমি কেন এসেছি। আমি না এলে ও তোমাকে কিছুই কিন্‌তে দিত না। বলে কি না, একটা মাদুর হ’লেই ওর চল্‌বে। শুনেছ কথা!”

অমর বলিল “ভাই পরেশ, তুমি এই নূতন কলিকাতায় এসেছ, এই প্রথম কলেজে ভর্ত্তি হয়েছ; এখানে পড়তে গেলে, থাক্‌তে গেলে কি কি দরকার, তা তোমার অপেক্ষা আমরা বেশী বুঝি। আমি যদিও কলেজে পড়তে এই প্রথম এসেছি, কিন্তু আমি অনেকবার কলিকাতায় এসেছি, অনেক মেসে ছিলাম। আমি যা করব, তার ওপর কথা বোলো না; আমি সব ঠিক করে দেব।”

পরেশ বলিল "তা জানি। কিন্তু তুমি ভাই, একটা কথা ভুলে যাচ্ছ—আমি গরিব। আমার বাবা থেকেও নেই; তিনি আমাকে একটী পয়সাও সাহায্য করবেন না। বাড়ীতে বিমাতা আছেন, তাঁর কাছেও কিছু আশা নেই। আমি ভিক্ষা করে পড়তে এসেছিলাম। হরিশ কাকা দয়া করে আমায় আশ্রয় দিচ্ছেন, নইলে যে পথে দাঁড়াতে হত! হরিশ কাকাও ত বড়-মানুষ নন। তুমি ত শুনেছ, উনি এক আড়তের ভাণ্ডারী, আমার এ জন্মের কেউ নন, পূর্ব্ব জন্মে নিশ্চয়ই আপনার জন ছিলেন। ওঁর দয়ার উপর এত অত্যাচার করা কি উচিত? তুমিই—"

পরেশের কথায় বাধা দিয়া হরিশ বলিল "দেখ বাবা পরেশ, তুমি আমার দয়ার কথা বোলো না। তুমি আমার কেউ নও; তুমি আমার প্রভুর দাস, আমি তাই তোমার সেবা করছি। তুমি একটী কথাও বোলো না। আমি প্রভুর আদেশে যা করব, তুমি মাথা পেতে তাই স্বীকার কোরো। মনে রেখ, আমি করেছি নে, প্রভু করছেন।"

অমর অবাক্ হইয়া হরিশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—এমন কথা ত সে মানুষের মুখে কখন শোনে নাই;—এমন দেবতা ত সে কখনও দেখে নাই;—মানুষ যে এত দীন, এত ভক্ত হতে পারে, তা সে পুস্তকে পড়িয়াছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখে নাই। আজ হরিশের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল; কি যে বলিবে ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে বলিল "হরিশ কাকা! তুমি আমারও কাকা। তোমাকে কাকা বলে

আমার জীবন ধন্য হোলো। তুমি মানুষ নও কাকা, তুমি দেবতা! ভাই পরেশ, পূর্ব্ব জন্মে অনেক পুণ্য করেছিলে, তাই ভগবান তোমাকে এমন দেবতার আশ্রয়ে এনে ফেলেছেন। কোন কথা বোলো না; উনি যা বলবেন, যা দেবেন, দেবতার আশীর্ব্বাদ বলে তা মাথায় নিও। হরিশ কাকা, তুমি যখন সময় পাবে, তখনই এখানে এসো; তোমার গায়ের বাতাস লাগলেও আমাদের মঙ্গল হবে।'

হরিশ হাতযোড় করিয়া তাহার প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিল "অমন কথা বোলো না বাবা, ওতে অপরাধ হয়। আমি প্রভুর দাস।"

[১২]

হরিশ আড়তে চলিয়া গেল; অমর ও পরেশ বাজার করিতে বাহির হইল। অমর বড়ই গোলে পড়িল, সে যে জিনিষটা পছন্দ করে, পরেশ তাহাতেই আপত্তি করে,—বলে "অমর এত দাম দিয়ে এটা কেনা কেন? এটা না হলেও আমার বেশ চলবে।"

অমর বলে "তুমি চুপ করে আমার সঙ্গে-সঙ্গে ফের না ভাই! আমি যা বুঝি, তাই করি। হরিশ কাকা আমার উপরেই সব ভার দিয়েছেন; তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন, তা জান?"

পরেশ বলিল "তা জানি, কিন্তু তুমিই ভেবে দেখ, হরিশ কাকা ত কেউ নয়; সে দয়া করে আমার পড়ার ভার নিয়েছে। দয়ার উপর কি এত জুলুম করতে পারা যায়? আজ যদি বাবা

আমার জিনিষপত্র কিন্‌তে আস্‌তেন, তা হ'লে এটা দাও, ওটা দাও, বলা শোভা পেত, এ যে দয়ার দান।"

অমরা গম্ভীরভাবে বলিল "দেখ পরেশ, তুমি হরিশ কাকার উপর অবিচার করছ। এ সংসারে আপন-পর কথাটার কোন অর্থ নেই; যার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ সেই আপনার জন, আর সবই পর, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আপনার জনও পর হয়ে যায় আর যাকে পর মনে করি, সেও আপনার হয়ে যায়। হরিশ কাকাও তোমার তেমনি আপনার জন।"

পরেশ হাসিয়া বলিল "আর তুমিই কি আমার পর ভাই! যে দিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, সেইদিন থেকেই আমার মনে হয়েছে, তুমি পূর্ব্ব জন্মে আমার কেউ ছিলে, নইলে কি আমার মত গরিবের উপর তোমার এত মায়া হয়।"

অমর পরেশের কথায় বাধা দিয়া বলিল "আচ্ছা সে বোঝা-পড়া পরে করা যাবে। এখন চল, আর সব কিনে ফেলি। সন্ধ্যার মধ্যে সব জিনিষ বাসায় রেখে তোমাকে আড়ত পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে যে।"

পরেশ বলিল "না, না, তার দরকার হবে না; আমি কি একেবারে ছেলেমানুষ যে, পথ হারিয়ে যাব।'

তাহার পর দুইজনে নানাস্থানে ঘুরিয়া প্রায় সমস্ত আবশ্যক দ্রব্য কিনিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। অমরের ঘরেই পরেশের সিট হইয়াছিল; সমস্ত জিনিষ ঘরে রাখিয়া অমর বলিল "এই বার চল, তোমাকে বাসায় রেখে আসি।"

পরেশ বলিল "না, এই এত কষ্ট করে হেঁটে-হেঁটে হয়রাণ

হয়ে এলে; এখন তুমি বিশ্রাম কর; আমি একলাই যেতে পারব।"

অমর বলিল "শেষে এই সন্ধ্যাবেলা পথ হারালে বড়ই বিপদ হবে; বুঝলে।"

পরেশ বলিল "সেজন্য ভেব না। আমি কাল বিকেল থেকেই এখানে থাক্‌ব। আড়তে সামান্য যা আছে, তা নিয়ে এসে এখানে রেখে কলেজে যাব; তা হলেই হবে।"

অমরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পরেশ আড়তে গেল। তাহাকে দেখিয়াই হরিশ বলিল "কি বাবা, সব কেনা হয়েছে ?" পরেশ মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল। তখন হরিশ বলিল "তা হ'লে কালই তুমি সে বাসায় যেও।"

পরেশ বলিব "কালই যাব। কিন্তু দেখ কাকা, তুমি অকারণ অনেকগুলো টাকা খরচ করলে। এত জিনিষের ত আমার মোটেই দরকার ছিল না।"

হরিশ বলিল "সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না; তোমার কি দরকার, তা তোমার চাইতে আমি বেশী বুঝি। যাও, অনেক হেঁটেছ, এখন একটু বিশ্রাম কর, আমি তোমার জন্যে খাবার এনে রেখেছি।"

পরেশ বলিল "খাবার কেন কাকা? তুমি কি আমাকে বাবু না করে ছাড়বে না?""

হরিশ বলিল "ভগবান করুন তুমি বাবুই হও।"

তখন পরেশ বলিল "কাকা, কাল যে চলে যাব, সে কথা ত বড়বাবুকে বল্‌তে হবে।"

হরিশ বলিল "সে ত ঠিক কথা! কিন্তু খবরদার, আমার নাম কোরো না।"

"যদি জিজ্ঞাসা করেন, তা হ'লে কি বলব?"

"বোলো, যা হয় এক-রকম করে জুটে যাবে।"

ইহার কিছুক্ষণ পরেই পরেশ দেখিল যে, বড়বাবু বারান্দায় একাকী বসিয়া আছেন। এই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া পরেশ ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "কি হে পরেশ, কোন কথা আছে না কি?"

পরেশ বলিল "আজ্ঞা, একটা কথা আছে।"

বড়বাবু বলিলেন "কি কথা ব'লে ফেল। যা বল্‌বে, তা ত বুঝেছি। আমি ত সেদিন বলেই দিয়েছি, এখানে থাক্‌তে গেলে মাসে ছয়টি ক'রে টাকা বাসাখরচ দিতে হবে। আমি ত আর এখানে সদাব্রত খুলি নাই যে, যে আস্‌বে তাকেই খেতে দেব। আমাদের বড় কষ্টের উপার্জ্জন, বুঝেছ ত! কান্নাকাটি করলে কিছুই হবে না বাপু, সে কথা বলেই রাখছি!"

পরেশ অতি ধীরভাবে বলিল "আজ্ঞা, সে কথা বল্‌তে আমি আসি নি। আমি কা'ল অন্য বাসায় যাব, তাই আপনাকে জানাতে এসেছি।"

"অন্য বাসায় যাবে? কোথায়?"

"একটা মেসে থাক্‌ব।"

বড়বাবু কহিলেন "তা হ'লে তোমার বাবা তোমার খরচ দিতে স্বীকার করেছে, বল।"

পরেশ বলিল "আজ্ঞা, না, বাবা আর খরচ দেবেন না।"

বড়বাবু কহিলেন "তা হ'লে কি করে মেসের খরচ চালাবে। এখানে ছয় টাকা দিতে পার না, মেসে যে পনর কুড়ি টাকা লাগবে, তা জান।"

পরেশ বলিল "এক-রকম ক'রে চলে যাবে।"

বড়বাবু ঠাট্টার সুরে বলিলেন "এক-রকম ক'রে! বলি সে রকমটা কি, শুনিই না। কল্‌কাতার পথে ত আর টাকা ছড়ান নেই যে, কুড়িয়ে নিলেই হ'ল। ও বুঝেছি, ছেলে-পড়ান পেয়েছ বুঝি।"

পরেশ বলিল "ছেলে পড়াতে হবে না। একজন দয়া করে আমার খরচ চালাবেন।"

"এমন দাতাকর্ণ কোথায় পেলে হে! তুমি ত দেখ্‌ছি খুব যোগাড়ে ছোকরা। কোন বড়মানুষের বয়াটে ছেলের সঙ্গে যুটেছ বোধ হয়। তা হ'লেই পরকাল ঝরঝরে হবে, একেবারে গোল্লায় যাবে।"

পরেশ এ কথার আর জবাব করিল না; সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বড়বাবু বলিলেন "তা যাবে যেও; কিন্তু বলে রাখ্‌ছি বাপু, আমরা তোমার গাঁয়ের লোক; শেষে যেন কোন হাঙ্গাম হুজ্জুতে আমাদের জড়িও না। লেখাপড়া যা হবে, তা ত বুঝতেই পেরেছি।"

পরেশ আর কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। হরিশ দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সব কথাই শুনিয়াছিল। পরেশ হরিশের ঘরে আসিলে একটু পরেই হরিশ আসিয়া বলিল "বড়বাবু যা বল্লেন, তা আমি আড়াল থেকে শুনেছি। এরা কি

মানুষ ? বাবা, মনে রেখ, পয়সা থাক্‌লেই মানুষ হয় না। তোমারও একদিন পয়সা হবে ; তখন এই কথা মনে রেখ বাবা। এক ফকিরের মুখে একটা গান শুনেছিলাম, তাই আমার মনে পড়ে ! ফকির গেয়েছিলল—

'মানুষ বড় কিসে, ভাবি তিন বেলা।
সে যে, ধন জন বিদ্যা পেয়ে
না বোঝে পরের জ্বালা।'

কথাটা বড় ঠিক বাবা, বড় ঠিক ; যে পরের জ্বালা বোঝে না, সে আবার কিসের মানুষ। প্রভু যেন তোমাকে আসল মানুষ করেন, এই প্রার্থনা আমরা দিনরাত করব।"

"এই আশীর্ব্বাদ কোরো কাকা, আমি যেন তোমার মত হতে পারি।"

"অমন কথা বোলো না বাবা, আমি মহাপাপী।" এই বলিযা হরিশ কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

একটু পরেই গদিয়ান রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় হরিশের ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, পরেশ সেই ঘরে বসিয়া পড়িতেছে। তিনি একটু পূর্ব্বেই বড়বাবুর নিকট পরেশের বাসা-ত্যাগের কথা শুনিয়া আসিয়াছিলেন ; তাই তিনি হরিশের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন "কি হে ছোকরা, তুমি না কি এখান থেকে চলে যাচ্ছ ?"

পরেশ বিনীত ভাবে বলিল "আজ্ঞা হাঁ।"

"কোথায় যাবে ?"

পরেশ বলিল "একটা মেসে থাক্‌ব।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন "এই এত কাঁদাকাটি, খরচ দেবার সাধ্য নাই ; আর এরই মধ্যে একেবারে মেসে থাকা। আমি আগেই জান্‌তাম, ও সব তোমার বাজে কথা ; খরচের টাকাটা বাঁচাবার জন্য ঐ সব ফন্দী। তা যাক্, বলি এখন খরচ আস্‌বে কোথা থেকে ?"

পরেশ বলিল "এক-রকম করে চলে যাবে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন "বাবা, এ কলকাতা সহর। এখানে এক-রকম করে চলে না।"

পরেশ বিরক্ত স্বরে বলিল "সে ভাবনা আমিই করব।"

চক্রবর্ত্তী বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "আরে শুনিই না, এমন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর কোথায় পেলে। নামটা জেনে রাখি। বলা ত যায় না, যদি কখন তোমার দয়ার সাগরের কাছে হাত পাততে হয়।"

পরেশ বলিল "যিনি আমাকে সাহায্য করবেন, তাঁর নাম বল্‌তে নিষেধ আছে।"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন "বেশ, বেশ। তা শেষে যেন সব হারিয়ে আবার এসে কেঁদে না পড়।"

পরেশের আর সহিল না ; সে কর্কশ কণ্ঠে বলিল "যদি ভিক্ষা করে খেতে হয়, তাহা হলেও আপনাদের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌তে আস্‌ব না—না খেয়ে মলেও না।"

"বেশ, বেশ" বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় চলিয়া গেলেন।

[১৩]

একটু পরেই হরিশ আসিয়া বলিল "বাবা পরেশ, একটা কথা যে একেবারেই ভুলে গিয়েছি. তোমার মাসী যে আজ একবার অতি অবিশ্যি দেখা করতে বলে দিয়েচে। এতক্ষণ সে কথাটা তোমাকে বল্‌তেই মনে ছিল না।"

পরেশ বলিল "আজ ত রাত্রি হয়ে গেছে কাকা, এখন ত আর যাওবা হবে না। কা'ল সকালেও সময় হবে না। তুমি মাসীকে বোলো, আর একদিন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাব।"

হরিশ বলিল "সে তা হ'লে বড় রাগ করবে, হয় ত বলবে যে আমি তোমাকে খবরটাই দিই নেই। তা, এখন সবে আটটা বেজেছে। কত দূরই বা, আর সেখানে দেরীই বা কি হবে। দেখা ক'রেই চলে এস। নইলে সে মনে দুঃখ করবে।"

পরেশ বলিল "তা হলে এখনই যাই।" এই বলিয়া সে আড়ত হইতে বাহির হইল।

মাসীর বাড়ীতে যাইতে দেখিল, দুর্গা তখনও তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই সে বলিল "হ্যাঁ বাবা, তোমার এত দেরী হ'ল কেন? আমি মনে করলাম, তুমি বুঝি এলে না।"

পরেশ বলিল "না মাসি, আস্‌ব না কেন? আজ আড়তে আস্‌তেই যে দেরী হয়েছে। আজ বাজারে গিয়ে সব জিনিস কিনে মেসে রেখে তবে ত আড়তে এসেছি।"

দুর্গা বলিল "সব কেনা হয়ে গেছে? কি কি কিনলে বল ত?"

পরেশ একে একে সমস্ত দ্রব্যের নাম করিল। দুর্গা বলিল "এই দেখেছ, তোমার কাকাকে যে এত করে বলে দিয়েছিলাম

যে, বাসন আর বিছানা যেন কেনা না হয়, সে কথা বুঝি তার মনেই ছিল না। সে ত সঙ্গেই ছিল, ও-গুলো কেনবার সময় আর বারণ করতে পারল না।"

পরেশ বলিল "কাকা ত আমাদের সঙ্গে বাজারে যায় নাই, আমি আর আমার মেসের সেই ছেলেটী অমর, আমরা দুইজনে সব কিনেছি।"

দুর্গা বলিল "তা হ'লেই হযেছে। তোমরা দুটী ছেলেমানুষে কিনেছ ত! কল্‌কাতার বাজার, সব জিনিস ঠকিয়ে দিযেছে, আর ভাল জিনিস একটাও হয় নাই। বাজার করা কি তোমা-দের কাজ। দেখ দেখি, নিজেই যদি যেতে না পারবি, তোর আড়তে ত কত লোক আছে, তাদের একজনকে ত সঙ্গে দিলেই হত'। ওর সব কাজই ঐ রকম। যাক্, যা হবার তা ত হয়েছে। দেখ বাবা, তুমি এক কাজ কোরো; আমি তোমাকে থালা, বাটী, গেলাস সব দিচ্ছি; এইগুলো তুমি ব্যবহার করো, সে-গুলো আমাকে একদিন দিয়ে যেও, সে সব কি আর ভাল হয়েছে; হয় ত দেনো থালা গেলাস, কি পুরোণো কিছুই গছিয়ে দিয়ে নূতন ভাল জিনিসের দাম নিয়েছে।"

পরেশ বলিল "না মাসি, জিনিস সব ভাল হয়েছে। আমিই যেন জানিনে, অমর কলকাতার হাটবাজার খুব চেনে, তাকে ঠকানো সহজ নয়।"

দুর্গা বলিল "তা হোক, সে সব তোমাকে আমি ব্যবহার করতে দেব না। আচ্ছা, পরীক্ষা করি।"

দুর্গার ঘরে অনেক বাসন সাজান ছিল। সে পরেশকে

বলিল "আচ্ছা, তুমি যে থালা গেলাস কিনেছ, আমার এর মধ্যে তেমন আছে ?"

পরেশ একখানি থালা ও একটা গেলাস দেখাইয়া বলিল "ঠিক এত বড়, এই রকমই থালা আর গেলাস কিনেছি। থালাখানার দাম নিয়েছে সওয়া তিন টাকা, আর গেলাসটা এক টাকা চৌদ্দ আনা।"

দুর্গা বলিল "তা হলেই হয়েচে ; ঐ থালাখানা আমি আড়াই টাকায় কিনেছিলাম ; আর গেলাসটা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে পাঁচ সিকের বেশী নয়, তা বলতে পারি। আরে বাবা, তোমাদের দুটী ছেলেকে দেখেই তারা বুঝেছিল, তোমরা বাঙ্গাল। তখন আর কি, দশটা মিষ্টি কথা বলে ঠকিয়ে দিয়েছে। যাক্ গে। তোমার কাকার ঐ রকম। আচ্ছা, কি কি বিছানা কিনেছ ?

পরেশ বলিল "একটা তোষক, একটা বালিশ, আর দুখানা বিছানার চাদর, আর একটা মাদুর।"

"আর কিচ্ছু না !"

"আর আবার কি দরকার মাসি ! মশারি বোলছ ? আমাদের মেসে মশা নেই, কেউ মশারি ব্যবহার করে না।"

দুর্গা বলিল "তা নয়, দুখানা বিছানার চাদরে কি করে চল্‌বে। একখানা ময়লা হোলে যদি ধোবার আস্‌তে দেরী হয়, তা হলে কি হবে ? এখানকার ধোবাদের ত জান না,—সে—ই কুড়ি দিন পরে জগন্নাথ-দেব এসে দেখা দেবেন ; আর যদি পালিয়ে গেলেন, তা হোলে ত আরও ভাল। তখন কি হবে ?"

পরেশ হাসিয়া বলিল "তখন মাসি, না হয় তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাব ?"

"তার চাইতে দুই-একখানা বেশী করে বাক্সে রাখলে দোষ কি ! যাক্ সে কথা ; সে যা হয় করছি। আলো কি কিনেছ ?

"কেন ? একটা ছোট দেখে বসান আলো কিনেছি। আমি ত মাটীর দেল্‌কো আর মাটীর প্রদীপই কিন্‌তে চেয়েছিলাম ; অমর কিছুতেই রাজী হলো না ; তাই ত তিনটাকা দিয়ে আলো কিন্‌তে হোলো। দেখ দেখি মাসি, তিন পয়সায় যা চলে, তাইতে তিন টাকা ! এ সব অপব্যয়।"

দুর্গা হাসিয়া বলিল "তোমার বক্তৃতা থাক্। ঐ যে একটা আলো কিন্‌লে, তাতে চল্‌বে কি কোরে। রাত-বিরেতে বাইরে যেতে হোলে, কি পায়খানায় যেতে হোলে, আলো পাবে কোথায় ? একটা হারিকেন কিনবার কথা বুঝি মনেও হলো না।"

পরেশ বলিল "মাসী-মা, তুমি যদি এত ভাব, তা হ'লে আর মেসে থাকা হয় না ; আর তা হ'লে আমার মত পরেশ হয়ে জন্মালে হয় না। কোথায় দুবেলা খেতে পেতাম না মাসি, কোন দিন জামা-জুতা জোঠে নি ; আর তুমি কি না বল্‌ছ, হারিকেন না হোলে বাইরে বেরুব কি করে ? না মাসি, তুমি আমার জন্ত এত ভেব না। আমার ভয় করে, এত সৌভাগ্য বুঝি আমার সইবে না। আমি তোমাদের কে, মাসি, যে তোমরা দুইজনে আমার জন্ত এত ভাব।"

দুর্গা কাতরস্বরে বলিল "তুই আমার কে, সে কথা ত ভাবি নাই বাবা! এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত ত নিজের ভাবনাই ভেবেছি। তাই বুঝি মহাপ্রভু তোকে এনে মিলিয়ে দিলেন। সন্তান-স্নেহ যে কি, তা ত জানিনে বাবা! সে পথ যে অনেক দিন ছেড়ে এসেছি। তুই এসে যে আমাকে সেই পথের সন্ধান দিলি বাবা! এতকাল এই কল্‌কাতা সহরে কত ছেলে দেখেছি, তোর চাইতে সুন্দর কত ছেলে দেখেছি; কৈ কাউকে ত ভালবাসিনি; কারু দিকে ত মন টানে নি। তোকে দেখেই যেন মনে হোলো, তুই আর জন্মে আমার কেউ ছিলি—বাবা, আমার ছেলে ছিলি। তাই তোকে দেখে আমার মত মহাপাপীর বুকের মধ্যেও ছেলের জন্য ভালবাসা জেগে উঠ্‌ল। অনেক পাপ করেছি বাবা; আর না। মহাপ্রভু তোকে সেই জন্যই এনে দিয়েছেন। তুই মাসী বলে ডাক্‌লে আমার যেন বুক জুড়িয়ে যায়। তাই ত তোর কথা এত ভাবি বাবা! কি বল্‌ব, আমার যদি শক্তি থাক্‌ত, তা হোলে একটা বাসা ক'রে তোকে নিয়ে থাক্‌তাম।"

পরেশ অবাক্ হইয়া দুর্গার কথা শুনিতে লাগিল। এমন কথা ত সে অনেক দিন শোনে নাই; তার মা আজ বেঁচে থাক্‌লে এর বেশী তাকে কি বল্‌তে পারতেন। সে কে? এত সৌভাগ্যের অধিকারী সে কোন্ পুণ্যের ফলে হইল, তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না। মাতৃহীন সন্তানের জন্য হরিশের হৃদয়ে এত স্নেহ, এত অনুগ্রহের সঞ্চার কে করিয়া দিল? দুর্গা বাজারের বেশ্যা, তাহার সংস্পর্শে আসিলে না কি পাপ হয়; কিন্তু পরেশের মনে হইল, এমন মহিয়সী রমণী জগতে আর নাই।

তাহার এমন কি গুণ আছে, যাহাতে এই দুইজন এমন করিয়া আকৃষ্ট হইল। পরেশ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে অতি কুণ্ঠিতভাবে বলিল "মাসি, কেন যে তোমরা আমাকে এত ভালবাস, তা আমি বুঝতে পারিনে।"

দুর্গা বলিল "তা আর তোমার বুঝে কাজ নেই বাবা! তুমি বেঁচে থাক, তুমি বিদ্বান হও; তোমাকে দেখে আমি সুখী হই। তা, সে কথা থাকুক। তুমি সন্ধ্যাবেলা কিছু খেয়েছ? তোমার কাকার ত সবই ঠিক থাকে! এমন মানুষ দেখি নাই।"

পরেশ বলিল "মাসী মা, হরিশ কাকার আর সব ভুল হোতে পারে, কিন্তু আমার কিছুই তার ভুল হয় না। তোমাকে ব্যস্ত হোতে হবে না, আমি জল খেয়ে এসেছি? রাত হচ্চে মাসী মা, আমি এখন যাই। কা'লই আমি মেসে যাব। তোমার ও-সব বাসনপত্র আমি নিয়ে যাচ্চিনে; আমার যদি অসুবিধা হয়, তা হলে চেয়ে নিয়ে যাব।"

দুর্গা বলিল "বেশ, তাই কোরো। এখন আমার কথা শোন। এই পাঁচটা টাকা নিয়ে যাও। আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যাও যে, রোজ কলেজ থেকে এসে পেটভরে জল খাবে। ও-সব বাসাড়ে যায়গায় যে খাওয়া হয়, তাতে ছেলেরা যে কেমন করে বেঁচে থাকে, তাই আমি ভেবে পাইনে। দেখ, আর এক কাজ কোরো; রোজ আধ সের কোরে দুধ ঠিক কোরো; নইলে বাঁচবে কি ক'রে। আমি তোমার জন্য দু সের ভাল ঘি কিনে রেখেছি, এখনই আড়তে নিয়ে যেও।"

পরেশ বলিল "ঘি কি হবে মাসী মা!"

"শোন ছেলের কথা। ঘি আবার কি হয়? খেতে হয়।"

পরেশ বলিল "সে কি করে হবে মাসী-মা! আমি দশজন ছেলের সঙ্গে একত্র বসে খাব, তার মধ্যে ঘি খাব কি করে? না, সে আমি কিছুতেই পারব না। তারা দশজনে যা খাবে, আমিও তাই খাব। নিজের জন্য পৃথক করে দুধ খাওয়া কি ঘি খাওয়া—সে হোতেই পারে না মাসী-মা! সে কি কেউ পারে! লজ্জা করে না! আর আমি এমনই কি হয়েচি যে,আমার রোজ ঘি-দুধ খেতে হবে। দেখ মাসী-মা, এত সুখ আমার অদৃষ্টে হয় ত সইবে না; আমার এই ভয় হচ্ছে।"

দুর্গা বলিল "অমন কথা বল্‌তে নেই, অমন করে অমঙ্গল ভাবতে নেই। তুমি যাই বল, তোমার জন্য আমি ঘি কিনেছি, ও দ্রব্য ত আমি আর কিছুতেই খরচ করতে পারব না; ও তোমাকে নিয়ে যেতেই হবে। একলা না খেতে পার, বাসার সকলকে দিয়েই খেও, তাতে ত আপত্তি নেই।"

পরেশ বলিল"মাসী-মা,তোমার কথা ত আমি অমান্য করতে পারি নে; আমি ঘি নিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু তোমাকে বল্‌ছি, অমন করে তুমি টাকা পয়সা নষ্ট কোরো না। আর কাকা আমাকে যে টাকা দেবে, তার থেকে আমার জলখাবারের পয়সা হবে। তুমি কেন টাকা দিতে চাচ্ছ।"

"না, না, সে আমি শুন্‌ছি নে। এ টাকাও ত তারই; আমি হাতে করে দিচ্ছি শুধু।"

পরেশ কি করিবে, টাকা পাঁচটি লইল। তাহার পর, প্রতি

রবিবারে একবার দেখা করতে আসবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আড়তে আসিল।

[১৪]

পরদিন প্রাতঃকালে আহারাদি শেষ করিয়া পরেশ হরিশকে বলিল "কাকা, আমার এগুলো কি করে নিয়ে যাব ?"

হরিশ বলিল "সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি কলেজে যাও। আমি তোমার যা কিছু এখানে আছে,সব তোমার বাসায় দিয়ে আসব।"

পরেশ বলিল"তুমি আর কষ্ট করে কেন যাবে কাকা! একটা লোক ঠিক করে দেও, সে আমার সঙ্গে যাবে। আমি জিনিস-গুলো বাসায় রেখে তারপর কলেজে যাব।"

হরিশ বলিল "না, সে কাজ নেই। আমাকে আজ তোমার বাসায় যেতেই হবে; আমি নিজে তোমার সব গুছিয়ে দিয়ে আসব। তোমার ত আড়াইটার সময় ছুটী হবে; আমি ঠিক সেই সময় তোমার বাসায় যাব; তুমিও ছুটী হ'লেই বাসায় যেও।"

পরেশ তখন বলিল "আচ্ছা কাকা, বড়বাবুকে নমস্কার করে যাব না ?"

হরিশ বলিল "তা বেশ কথা, তাঁকে ব'লে যাওয়াই উচিত। গ্রামের লোক, বড়মানুষ; এ কয়দিন ত আশ্রয় দিয়েছিলেন; তাঁকে না ব'লে চলে যাওয়া কিছুতেই উচিত হয় না। আরও এক কায কোরো। বাসায় গিয়ে ছোটবাবুকে সব কথা খুলে জানিয়ে একখানি পত্র লিখে দিও।"

পরেশ বলিল "ঠিক কথা কাকা; ও কথাটা আমার মনেই

ছিল না। পূর্ব্বেই তাঁকে এ সব কথা জানান উচিত ছিল। অবশ্য তাতে কোন ফল হোতো না; তিনি বড়বাবুর আদেশ অমান্য করতে পারতেন না। আমি কা'লই তাঁকে চিঠি লিখব।'

তাহার পর পরেশ ধীরে ধীরে বড়বাবুর নিকট গেল। বড়-বাবু তখন বাহিরের বারান্দায় একখানি চৌকির উপর বসিয়া ছিলেন। পরেশকে আসিতে দেখিয়াই তিনি বলিলেন "কি পরেশ, নূতন বাসায় যাওয়া স্থির করলে?"

পরেশ বলিল "আজই যাব, ও বেলা থেকে আর আড়তে আসব না।"

বড়বাবু বলিলেন "তাই ত হে, তুমি গ্রামের লোক। কার ভরসায় চল্লে, তাও ত বল না। তোমার বাবা সিদ্ধেশ্বর আমাদের বিশেষ অনুগত। সেই বা কি মনে করবে, আর গ্রামের দশজনই বা কি বল্‌বে। তোমার ভালমন্দ হ'লে ত আমাকেই দুকথা শুন্‌তে হবে। আর সৃষ্টিধর তোমাকে পাঠিয়েছিল। তুমি চ'লে গেলে সেই বা কি ভাববে। তাই ত; তুমি কি সৃষ্টিধরকে কিছু লিখেছ? তুমি যে আড়ত থেকে চ'লে যাচ্ছ, এ কথা তোমার বাবা জানেন?'

পরেশ বলিল "না, বাবাকে কিছু জানাই নাই; তাঁকে আর জানিয়ে কি করব; তিনি ত আর কিছু সাহায্য করতে পারবেন না। ছোটবাবুকেও এ কথা লিপি নাই, লেখা কর্ত্তব্য মনে করি নাই। আপনি কর্ত্তা আপনি যা বল্‌বেন, তাই হবে। ছোটবাবু ত আপনার কথাই বলেছিলেন।"

বড়বাবু বলিলেন "তাই ত পরেশ, তোমাকে যেতে দেওটা

ভাল হয় নাই; সৃষ্টিধর এ কথা শুনে মনে হয় ত দুঃখ করবে। তা দেখ, যে তোমার খরচ দেবে, তাকে বল না কেন যে, তুমি এই আড়তেই থাক্‌বে। সে যখন তোমার এত বেশী খরচ বইতে চাইচে, তখন তোমার খরচ যদি কম হয়, তাতে তার আপত্তি কেন হবে? সে খুব স্বীকার করবে। মাসে ছয় টাকা খরচের কথা বলেছিলাম—তা যাক্‌, তুমি গ্রামের লোক, সিদ্ধেশ্বরের ছেলে, তুমি পাঁচ টাকা হিসাবেই দিও। সৃষ্টিধর তোমাকে পাঠিয়েছে—যাক্‌, এক টাকা ছেড়েই দিলাম। বেশ, তাই কর। আড়ত থেকে আর চলে গিয়ে কাজ নেই, এখানেই থাক।"

পরেশ বলিল "আপনাদের আশ্রয়ে থাক্‌ব বলেই ত এসেছিলাম। আপনি যখন খরচের কথা বল্লেন, তখন কি করি, অন্য চেষ্টা দেখতে হোলো। যিনি আমাকে সাহায্য করবেন, তিনি আমার মেসে থাকাই স্থির করেছেন, যা যা দরকার সব কিনে দিয়েছেন, মেসে সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন সেখানে যেতে অস্বীকার করলে তিনি রাগ করবেন, হয় ত আর সাহায্য করবেন না। আমি এখন মেসেই যাই; সেখানে যদি অসুবিধা হয়, তা হ'লে আবার আপনাদের আশ্রয়েই আসব।"

বড়বাবু বলিলেন "কে তোমাকে সাহায্য করবেন, তাঁর নাম জান্‌তে পারলে বুঝতে পারতাম, তুমি ভাল লোকের উপর নির্ভর করছ কি না। দেখ, এই কল্‌কাতার বড়লোকের উপর বিশ্বাস কোরো না; তারা কখন যে কি মেজাজে থাকে, তা বলা যায় না। আজ হয় ত তোমার অবস্থার কথা শুনে দয়া হয়েছে, আর অমনি তোমাকে সাহায্য করবেন, হাতী ঘোড়া দেবেন, ব'লে বসেছেন;

দুদিন গেলেই হয় ত বল্‌বেন, আর খরচ দেব না। তখন কি করবে? এ দেশের লোকের কথায় ভুলে যাচ্ছ, যাও,কিন্তু আমার ত মনে হয় তোমার সব দিক্ যাবে। তা দেখ,যা ভাল বোঝ কর; শেষে বল্‌তে পারবে না যে. আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিলাম।"

পরেশ বলিল "আজ্ঞা, সে কথা আমি বল্‌ব না। আমি তা হ'লে এখন আসি, কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে।" এই বলিয়া পরেশ বড়বাবুকে নমস্কার করিল। বড়বাবুও হাত তুলিয়া নমস্কারেরই ভাব দেখাইয়া বলিলেন "তা এস; মধ্যে-মধ্যে এসে খবর দিয়ে যেও।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া পরেশ বড়বাবুর সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিল।

হরিশ জিজ্ঞাসা করিল "বড় বাবু কি বল্লেন বাবা?"

পরেশ বলিল "তিনি আড়তেই থাক্‌তে বললেন, খরচ এক টাকা কম নিতে চাইলেন। আর ভয় দেখালেন যে, কলকাতার লোকের খেয়ালের উপর নির্ভর করে যাচ্ছি; যে এখন সাহায্য দিতে চাচ্ছে,সে হয় ত দুদিন পরে দেবে না; তখন আমার দুর্গতি হবে। কাকা! বড়বাবু যখন কথাগুলো বলছিলেন, তখন এক-একবার আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, ব'লে ফেলি যিনি আমাকে সাহায্য করছেন, তিনি আর কেহই নহেন, আপনাদেরই হরিশ ভাণ্ডারী। চন্দ্রসূর্য্য ডুবে গেলেও তাঁর কথা অন্যথা হবে না। কিন্তু তখনই তোমার নিষেধের কথা মনে হ'ল, তাই বড়বাবুকে জানিয়ে দিতে পারলাম না যে, তাঁহাদের আড়তে ভাণ্ডারীর মুখস প'রে এক দেবতা রয়েছেন। যাক, একদিন এসে সব কথা ব'লে যাব।"

হরিশ বলিল "অমন কাজও কোরো না বাবা! লোকে যা ইচ্ছা তাই বলুক না, তাতে কি যায় আসে। তা হোলে তুমি আর দেরী কোরো না, যাও। আমি ঠিক আড়াইটার সময় তোমার বাসায় যাব।"

পরেশ বই কয়খানি লইয়া বাহির হইবে, এমন সময় আড়তের গদীয়ান, সেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরেশ ভদ্রতার খাতিরে তাঁহাকে বলিল "আমি আজই দেশে যাচ্ছি।" এই বলিয়াই সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন "তাই ত হে, তুমি সত্যিসত্যিই চল্লে। কিন্তু বাপু, কাজটা ভাল কর্‌লে না। বড়মানুষের আশ্রয় কি ছাড়তে হয়! কোথায় কোন্ কল্‌কাতার কাপ্তেনের পাল্লায় পড়ে গিয়েছ, তোমার এ-কূল ও-কূল দুই-ই যাবে। এই ত বড়-বাবু বলছিলেন, তোমার বাসাখরচ কম করে নেবেন। তাতেও যখন তুমি থাক্‌ছ না, তখন তোমার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে, তা আমি দিব্যিচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আর এমন দাতাকর্ণই যে কোথায় পেলে, তাও ত কাউকে বল না। যাক্, যাচ্ছ যাও, কিন্তু আবার যেন এসে ঘ্যানঘ্যান কোরো না বাপু!"

হরিশ নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার আর সহ্য হইল না, সে বলিল "আহা, ছেলেটা চলে যাচ্ছে,তবুও আপনার রাগ আর মেটে না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "না হে হরিশ; হাজারও হোক, বাবুদের গাঁয়ের ছেলে; তার ভালমন্দ ত দেখতে হয়।"

হরিশ বলিল, "ভালমন্দ যা দেখ্‌বার তা ত দেখ্‌লেন। এখন চলে যাচ্ছে, এখন আশীর্ব্বাদ করুন,যাতে ছেলেটা ভাল থাকে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন "তা,তা কি আর করব না হরিশ। ছেলেটা কিন্তু বড় ভাল। তোমার ভাল হবে হে ছোক্‌রা, আমি আশীর্ব্বাদ করছি।" পরেশ হরিশের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

[১৫]

পরেশ আর কলেজ হইতে আড়তে গেল না। অড়াইটার সময় কলেজ বন্ধ হইলেই অমরের সঙ্গে সে তাড়াতাড়ি মেসে যাইয়া দেখে, হরিশ তাহার পূর্ব্বেই আসিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া হরিশ বলিল "আমি একটু সকাল ক'রেই এসেছি। দেখ দেখি তোমার সব ঠিক হয়েছে কি না?"

অমর দেখিয়া বলিল "হরিশ কাকা, তুমি বুড়োমানুষ, এ সব করতে গেলে কেন? আমরা বুঝি আর সব গোছাতে পারতাম না।"

হরিশ বলিল "দেখ, চুপ করে বসে থাকা আমার পোষায় না। তোমাদেরও ত এ সব গোছাতে হোতো; আমিই না হয় ঠিকঠাক্ করে রাখলাম; তাতে আর কি হয়েছে।"

অমর বলিল "হয় নাই কিছু; কিন্তু তোমার এত হয়রাণ হবার দরকার কি ছিল?" তাহার পর তক্তপোষের দিকে চাহিয়া বলিল "হরিশ কাকা, তুমি তক্তপোষের নীচের এ ইট-কখানা কোথায় পেলে?"

হরিশ হাসিয়া বলিল" ঐত বাবা,তোমাদের কি অত খেয়াল

থাকে। আমি আসবার সময় ইট-কখানি আড়ত থেকে নিয়ে এসেছি।"

পরেশ বলিল "বৃথা কুলী-খরচা করে ইট আনবার কি দরকার ছিল। দোতালার ঘরে তক্তপোষ পাততে আর ইটের দরকার হয় না। তোমারও যেমন কাষ নাই কাকা!"

হরিশ বলিল এই "চারিখানা ইট আর তোমার ঐ কয়েকখানা বই আর কাপড় এইটুকু পথ আনতে আবার কুলী-খরচা হবে কেন?"

অমর বলিল "হরিশ কাকা,তবে কি এ সব তুমি নিজে মাথায় ক'রে নিয়ে এসেছ?"

হরিশ বলিল "তাতে কি হয়েছে; আমি ত আর বাবু নই। মাথায় মোট বইতে আমার লজ্জা কি?"

পরেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল "দেখ কাকা,তুমি অমন কষ্ট কোরো না। তুমি নিজে মাথায় কোরে এ সব আনবে জানলে, আমি তোমাকে আজ আসতেই দিতাম না। কি অন্যায় তোমার কাকা!"

হরিশ সহাস্যমুখে বলিল "আজ তোমার কাকা হয়েছি বলে কি আজন্মের অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে বাবা! তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন যে,আমি আড়তের চাকর; আমাকে এখনও মাথায় করে বাজার বইতে হয়। আর এতে দোষই বা কি? তবে যেদিন তুমি লেখাপড়া শিখে বড় চাকরী করবে, বড়মানুষ হবে, সেদিন না হয় তোমার কাকা মোট বওয়া ছেড়ে কর্ত্তা হয়ে বসবে। কি বল বাবা!"

পরেশ বলিল "সে যা হবার হবে কাকা! আমি কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমার জন্য তুমি আর এমন কষ্ট-স্বীকার কোরো না।"

হরিশ বলিল "কার জন্যে কে কষ্ট করে বাবা। যাঁর কাজ তিনি ক'রে নেন; ও সব কিছু মনে কোরো না। এখন দেখ, সব ঠিক হোলো কি না।" তারপর অমরের দিকে চাহিয়া বলিল "দেখ বাবা, পরেশ ছেলেমানুষ; দেখচ ত, ও কিছুই জানে না, কিছু বোঝেও না। আমি ওকে তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি। তুমি ওকে দেখো-শুনো। আর ওর যদি একটু শরীর খারাপ দেখ, অমনি আমাকে খবর দিও। আমি ত যখন সময় পাব, তখনই এসে তোমাদের দেখে যাবই। তবুও শরীরের কথা ত বলা যায় না।"

অমর বলিল "হরিশ কাকা, তুমি পরেশের জন্য একটুও ভেবো না; আমরা দুই ভাইয়ের মত থাকব।"

হরিশ তখন উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল "এখন তবে আসি বাবা! আজ হোলো মঙ্গলবার, আমি আবার শুক্র শনি-বার নাগাদ আসব।" এই বলিয়া হরিশ বাহির হইয়া গেল।

অমর তখন পরেশকে বলিল "দেখ ভাই, তোমার বড়ই সু-অদৃষ্ট। নইলে কি এমন কাকা তোমার হয়। হরিশ কাকা মানুষ নয়, দেবতা। আমি কত লোক দেখেছি, কত বড়-মানুষের, কত মহাপুরুষের কথা পড়েছি; কিন্তু এমন মানুষ আমি কখন দেখি নি। এই দেখেই মনে হয়—

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear ;
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air."

কি বল ভাই, ঠিক না। এমন মানুষ কি হয়!"

পরেশ বলিল "হরিশকাকা সত্যসত্যই দেবতা। এই দেখ না, আমি কোথাকার কে, কোন দিন চেনা ছিল না। দুই দিনের মধ্যেই হরিশ কাকা আমাকে একেবারে আপনার করে নিয়েছে। এই কলিকালে যে এমন মানুষ থাক্‌তে পারে,তা আমি জানতাম না।" এই বলিয়াই পরেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

অমর বলিল "পরেশ, হরিশ কাকার কথা বল্‌তে বল্‌তে তুমি অমন বিষণ্ণ হলে কেন?"

পরেশ বলিল "হরিশ কাকা আমাকে এত স্নেহ করেন, আমার জন্য এত করছেন; হরিশ কাকা ত আমার কেউ ছিলেন না। কিন্তু যাঁরা আমার আপনার জন, যিনি আমার পিতা, তিনি একবারও আমার দিকে চাইলেন না, আমি বেঁচে আছি কি না, সে খবর নেন না। আচ্ছা ভাই মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি বাবারও স্নেহ লোপ পায়?"

অমর বলিল "সকলের বাপেরই পায় না। যার যেমন অদৃষ্ট। তুমি ও-সব কথা মনে করে দুঃখ কোরো না। তুমি যে আশ্রয় পেয়েছ,শত জন্ম তপস্যা করেও লোকে এমন আশ্রয় পায় না। তা যাক্, এখন একটু জলখাবার ব্যবস্থা করা যাক্, কি বল? দেখ, আমি কলেজ থেকে এসে চা তৈরি করি; আর সেই চায়ের সঙ্গে

রুটী খাই। এখনই ঝী রুটী নিয়ে আস্‌বে। আজ থেকে তুমি আস্‌বে বলে, আমি চার পয়সার একখানা রুটী আন্‌তে বলে দিয়েছি; আমার টেবিলের উপর ঐ কৌটোটায় চিনি আছে। আমরা দুই জনে বিকেলে চা আর রুটীই খাব। দোকানের খাবার খেলে অসুখও করে, পয়সাও বেশী লাগে, পেটও ভরে না।"

পরেশ বলিল "ভাই অমর, আমার ত চা বা রুটী খাওয়া অভ্যাস নাই। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ; আমরা ও সব জিনিস কোন দিন চক্ষেও দেখি নাই। আর বিকেল বেলায় আমার মোটেই ক্ষিদে পায় না। যে দিন ক্ষিদে পাবে, সেদিন এক পয়সার মুড়ি কিনে খেলেই হবে। তুমি ও-সব আমার জন্য কোরো না।"

অমর বলিল "দুদিন মেসে থাক, তা হলেই বুঝতে পারবে, ক্ষিদে পায় কি না। এ ত আর তোমার আড়ত নয় যে, ডাল তরকারী মাছ খুব খাবে। সেই দুই হাতা ডাল, দুখানি আলু কি বেগুন ভাজা, আর একটা চচ্চড়ি, তাতে না আছে এমন জিনিস নেই। মাছ ত নেই বল্লেই হয়; দুখানি আলু আর এক টুকরা নামমাত্র মাছ। এই হচ্চে মেসের আহার, বুঝলে। সুতরাং সকালে বিকেলে পেটভরে জল না খেলে, দুদিনেই মরার দাখিল হবে, জান?"

পরেশ হাসিয়া বলিল "তুমি মেসের খাওয়ার যে ফর্দ্দ দিলে, তা ত আমার পক্ষে রাজভোগ। আড়তের সঙ্গে তুলনার কথাটা বলছি। আড়তে কি খেতে দেয় জান? কলেজে আস্‌বার সময় অনেক দিনই ত খেতে পাওয়া যায় না, উপবাস করতে হয়। যে দিন খেতে পেতাম, সে দিন চারটী ভাত, আর খানিকটা খেসারির

ডাল, আর কিছু না। রাত্রিতেও প্রায় ঐ রকম, বেশীর ভাগ একটা তরকারী, আর একদিন অন্তর রাত্রিতে সামান্য একটু মাছ; কিন্তু সেও ঐ পর্য্যন্ত। অনেক দিন ঝোলের মধ্যে মাছ খুঁজেই পাওয়া যেত না। একটা মজার কথা শুন্‌বে? আমরা আড়তে এক দিন রাত্রিতে পাঁচ সাত জনে খেতে বসেছি। ঠাকুর মাছের ঝোল দিয়ে গেল। একজন বল্‌লে 'ও ঠাকুর, মাছ কৈ? এ যে সুধু কাঁচা-কলা!' ঠাকুর বলে উঠ্‌ল 'ওগো, ঐ মাছ, ওতে কাঁটা নেই।' আমরা প্রায়ই ঐ রকম কাঁটাহীন মাছই খেতে পেতাম। কিন্তু তোমাকে বল্‌তে কি, আমার তাতে কোন কষ্টই হোত না। একজন দয়া করে খেতে দিচ্ছেন, এই যথেষ্ট; তার মধ্যে আবার বিচার করতে গেলে হবে কেন? দুটো ভাত আর একটু ডাল হলেই আমার বেশ খাওয়া হয়; তাতেই আমার পেট ভরে।"

অমর হাসিয়া বলিল "এইখানে তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। আমি ভাই, অমন ডাল-ভাত খেতে পারি নে; আমার খাওয়াটা ভাল চাই। তা মেসে আর আমার জন্য পৃথক করে কে কি করে দেবে; তাই আমি জলখাবার খেয়েই ও-সব পুষিয়ে নিই। এই ধর চা। চায়ের চলন ত এখন তেমন নেই, কিন্তু আমি বড় বেশী চা খাই। এ অভ্যাস বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। বাবা খুব চা খান। আমিও তাঁর কাছে থেকে-থেকে চা-খোর হয়েছি। দেখ, চা জিনিসটা বেশ। আমি বল্‌ছি, তুমি যদি দুদিন খাও, তা হলে আর ছাড়তে চাবে না। আমাদের দেশে এখনও ও-জিনিসটার তেমন চলন হয় নাই; কিন্তু হবে।"

পরেশ বলিল "দেখ, ও-সব জঞ্জাল যত বাড়াবে, তত বাড়বে। ওর অপেক্ষা আমাদের মুড়ি, গুড়, নারকেলই ভাল ; যত ইচ্ছা খাও, কোন অপকার হবে না ; আর এ-দিকে খরচও কম। আমি মুড়ি জিনিসটা খুবই ভালবাসি।"

এই সময় হরিশ পুনরায় সেখানে আসিল, তাহার হাতে এক ঠোঙ্গা খাবার। সে ঘরের মধ্যে আসিয়াই বলিল "দেখ দেখি, তোমাদের এখানে এলাম, চলে গেলাম, একবার জিজ্ঞাসাও করলাম না যে, তোমরা এখন কি খাবে। হেদোর কাছে গিয়ে তবে কথাটা মনে হোলো। তাই আবার ফিরে এলাম। এই খাবারগুলো দুজনে খাও।" এই বলিয়া সে অমরের হাতে খাবারের ঠোঙ্গা দিতে গেল।

অমর বলিল "হরিশ কাকা, তোমার মত পাগল ত দেখি নাই। তুমি কি না অতটা পথ গিয়ে আবার খাবার নিয়ে ফিরে এলে। আমরা কি খাব না খাব, তা ঠিক করে ফেলেছি ; সে ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছে। ঝী এখনই রুটী নিয়ে আসবে। আমরা তাই খাব। তুমি কেন অকারণ কতকগুলো পয়সা খরচ করে খাবার নিয়ে এলে ?"

হরিশ বলিল "বাবা, যখন ছেলের বাবা হবে, তখন বুঝবে হরিশ কাকা কেন ফিরে এল। সে কথা থাক্ ; এখন দুজনে এইগুলো খাও দেখি। তোমাদের খাওয়া হলে তবে আমি যাব।"

পরেশ বলিল "কাকা, তুমি এমন করে পয়সা খরচ কোরো না। তুমি এমন ক'রলে আমি পালিয়ে যাব। কতগুলো পয়সা অপব্যয় করলে।"

হরিশ বলিল "বাবা, অপব্যয় অনেক করেছি। এখন দুদিন একটু সদ্ব্যয় করতে দাও।"

পরেশ ও অমর তখন হরিশের হাত হইতে খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া দ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার করিল। হরিশ হৃষ্টচিত্তে বলিল, "তোমরা যে খেলে, তাই দেখে আমার যা আনন্দ হোলো, তা আর বল্‌তে পারি নে। তা হ'লে আমি এখন আসি। তোমরা খুব সাবধানে থেকো। আমি এই দুই তিন দিনের মধ্যেই আবার আস্‌ছি। একটু দূর হয়েছে, নইলে রোজই একবার করে আসতাম।"

অমর বলিল "না হরিশ কাকা, তোমাকে রোজ কষ্ট করে আস্‌তে হবে না। আমরাই যখন-তখন গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে আস্‌ব।"

হরিশ চলিয়া গেল। অমর বলিল "পরেশ, এত স্নেহ-মমতা আমি কখনও দেখি নাই।"

[১৬]

দুর্গা হরিশকে বলিয়া দিয়াছিল যে, মেস্ হইতে ফিরিবার সময় সে যেন পরেশের খবর তাহাকে দিয়া যায়। মেসে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল; তবুও হরিশ মনে করিল, তাড়াতাড়ি পরেশের সংবাদ দুর্গাকে দিয়াই সে আড়তে চলিয়া যাইবে; একটুও বিলম্ব করিবে না। সে দুর্গার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, দুর্গা [illegible] "যা হোক, এতক্ষণে তোমার সময় হোলো; আমি [illegible] থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। আর আমি [illegible] লাম, পরেশকে একবার সঙ্গে করে নিয়ে এসো;

হরিশ বলিল, "ছেলেটা কল্‌কাতার কিছুই জানে না ; তাই তার সব গুছিয়ে দিয়ে আস্‌তে একটু দেরী হয়ে গেল। তার পর, বেরিয়ে এসে মনে হলো বিকেলে সে কি খাবে, তার ত কিছুই বলা হয় নি। তাই আবার হেদোর ধার থেকে ফিরে গেলাম। যাবার সময় একটা দোকান থেকে কিছু খাবারও কিনে নিয়ে গেলাম।"

দুর্গা বলিল "এই দেখ ত, দোকানের খাবার নিয়ে গেলে কেন ? ও যে বিষ ! ছেলেমানুষ, পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, ওসব কচুরী জিলেপী খেলে ওদের অসুখ করবেই করবে।"

হরিশ হাসিয়া বলিল "তা হ'লে তুমি কি বল যে, তুমি রোজ খাবার তৈরি করে রাখবে, আর আমি গিয়ে দিয়ে আস্‌ব। রোজ এই এতখানি পথ যাওয়া-আসা ত আমার সইবে না দুর্গা ! আর রোজ-রোজ আড়ত থেকে যাই-ই বা কি করে।"

দুর্গা বলিল "এই শোন দেখি কথা। আমি যেন ওঁকে রোজ খাবার ব'য়ে নিয়ে যাবার কথাই বল্‌ছি। দেখ হরি ঠাকুর, ছেলেটাকে দেখে আমার যে কি মায়া হয়েছে,তা আর তোমাকে কি বল্‌ব। আমার ইচ্ছে করে, ওকে কাছে রেখে মানুষ করি। কি অদৃষ্টই করে এসেছিলাম, আর কি মতিই হয়েছিল, জন্মের কোন সাধই মিটল না ; পাপের বোঝাই মাথায় করে রইলাম। ভগবান এ জন্মে অদৃষ্টে এই সব লিখেছিলেন, কে খণ্ডাবে। এখন যে দু'দিন বেঁচে আছি, একটা কিছু কাজ নিয়ে থাক্‌[illegible] [illegible]। তোমায় কত দিন বলেছি, আমাকে বৃন্দাবনে পাঠি[illegible] ; আমার পাপের ধন যা আছে, সেখানে বিলিয়ে দি[illegible]।

হরিনাম করি, আর ভিক্ষে করে এক-বেলা এই পোড়া পেটের জ্বালা মিটাই। কিন্তু তোমায় বল্‌তে কি হরি ঠাকুর, এই ছেলেটাকে দেখে অবধি আমার আর বৃন্দাবনে যাবার কথাও মনে হয় না। ও নিশ্চয়ই আর জন্মে আমার কেউ ছিল; তাই শ্রীহরি তোমার হাত দিয়ে ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ সব তাঁরই খেলা হরি ঠাকুর, তাঁরই খেলা!"

হরিশ তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু দুর্গা যে কথার অবতারণা করিল, তাহা শুনিয়া সে আড়তের কথা ভুলিয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল; বলিল "যা বলেছ দুর্গা, আমিও ত মনে করেছিলাম, আর কেন, মেয়েটাকে ভাল ঘরে দিয়েছি, তার ছেলেপুলেও হয়েছে; সে সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে। এখন, জমাজমি যা আছে, আর দেশের বাড়ীখানা মেয়ের নামে লিখে দিয়ে, যে কয়টা টাকা হাতে আছে, তাই নিয়ে কোন তীর্থস্থানে গিয়ে বাকী কয়টা দিন কাটিয়ে দিই। আমি ভাব্‌লে কি হয়, রাধারাণী যে আমার জন্য আর এক শেকল গড়িয়ে রেখেছেন, তা ত জান্‌তাম্ না। বাবুদের গাঁ থেকে ছেলেটা আড়তে পড়তে এল, আর আমি তার মায়ায় আটকে পড়ে গেলাম দুর্গা! এখন আমার শুধু চিন্তা, কেমন করে পরেশ মানুষ হবে। ছেলেটা পূর্ব্ব জন্মে আমাদের কেউ ছিল, এ কথা আমি নিশ্চিত বল্‌তে পারি; তা নইলে তোমার প্রাণের মধ্যেই বা এত মায়া জেগে উঠ্‌বে কেন?"

দুর্গা বলিল "হরি ঠাকুর, তুমি পরেশকে যে বাসায় রেখে সেখানে ত ওর খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট হবে না?

বিদেশে ত কখন আসে নাই; মা-হারা ছেলে, বাপ থেকেও নেই। বড়ই কষ্ট পরেশের!" বলিয়া দুর্গা অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিল। পরের ছেলের জন্য, পরের দুঃখের কথা ভাবিয়া এমন করিয়া চক্ষের জল বুঝি মায়ের জাতিই ফেলিতে পারে। দুর্গা কুলত্যাগিনী, দুর্গা রূপ বেচিয়া জীবনধারণ করিয়াছে; কিন্তু ভগবান যে তাহার সেই পাপকলুষপূর্ণ হৃদয়ের এক কোণে একটা কি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া দুর্গাকে এই শেষ অবস্থায় ভগবানের পথে লইয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে এই পরেশ ছেলেটী আসিয়া তাহার হৃদয়ের পাষাণ-চাপা উৎস-মুখ হইতে পাথরখানি সরাইয়া দিল; আর সেই উৎসমুখে ভোগবতী-ধারা উৎসারিত হইয়া তাহার সমস্ত পাপ-কালিমা ধুইয়া দিল; তাহার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় মহিমময়ী জননীর পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই কয়েক বিন্দু অশ্রু দুর্গার সেই জননীত্বেরই নিদর্শন।

এই স্থানে দুর্গার পূর্ব্বজীবনের কথা একটু বলি। দুর্গা কায়স্থের কন্যা। তাহার পিতার অবস্থা মন্দ ছিল না। তাঁহাকে কখন পরের চাকরী করিতে হয় নাই; নিজের জোতজমা ছিল, তাহা হইতেই তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। সংসারে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা দুর্গা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। স্ত্রী সর্ব্বদাই একটা না একটা রোগে ভুগিতেন। এই কারণে তাঁহার বিশেষ অনুরোধে নয় বৎসর বয়সের সময় দুর্গার বিবাহ হয়। কন্যার বিবাহ দেখিবার জন্যই বোধ হয়, তাহার মাতা এতদিন জীবিতা

ছিলেন। দুর্গার বিবাহের তিন মাস পরেই তাহার মাতার মৃত্যু হইল। বয়স অল্প বলিয়া দুর্গার পিতা কন্যাকে বাড়ীতেই রাখিয়াছিলেন; স্ত্রীবিয়োগে তিনি বড়ই কষ্টে পড়িলেন। তখন গ্রামের দশজনের অনুরোধে তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রামের এক দরিদ্রা বিধবার ষোল বছরের একটী মেয়েকে বিবাহ করিয়া একেবারে শূন্য গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; একটী সংসার আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে পড়িল। দুর্গার বিমাতা তাহার বিধবা মাতা ও ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিল। তাহারা দুর্গার পিতাকে সুপরামর্শ প্রদান করিয়া দুর্গাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইয়া দিল। দশবৎসর বয়সেই দুর্গা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামিগৃহে চলিয়া গেল। দুর্গার পিতা ও বিমাতা নিশ্চিন্ত হইলেন।

সাত বৎসর দুর্গা স্বামীর ঘর করিল। সেখানে তাহার কোনই কষ্ট ছিল না। তাহার স্বামী গ্রামের জমিদারী-সেরেস্তায় চাকরী করিত; বেতন ও অন্যান্য বাবদে সে যথেষ্ট টাকা পাইত। তাহার বৃদ্ধ মনিব জমিদার বাবুর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র নবীন যুবক যশোদালাল যখন জমিদারীর ভার পাইল, তখন দুর্গার স্বামী নরেশচন্দ্রের বড় ভাবনা হইয়াছিল, কারণ যশোদালাল নরেশচন্দ্রকে বড় ভাল চক্ষে দেখিত না। নরেশচন্দ্র সচ্চরিত্র যুবক; সে প্রভুপুত্রের বদ্‌খেয়ালে যোগ দিতে পারিত না; নানা কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া কোন প্রকারে চাকরী বজায় রাখিত। বৃদ্ধ জমিদারের মৃত্যুর পর নরেশ বুঝিতে পারিল, হয় তাহাকে অন্যত্র-চাকরীর চেষ্টা করিতে হইবে; আর না হয় যশোদালালের মোসায়েবীতে ভর্ত্তি হইয়া নরকের পথে পদার্পণ করিতে হইবে।

করেন না।” নরেশ দুর্গার এ কথার মধ্যে অন্য কোন ভাবই দেখিল না, ইহা কৃতজ্ঞতা মনে করিয়াই সে চুপ করিয়া গেল।

যশোদালাল দেখিল, এ ভাবে অগ্রসর হইলে তাহার বাসনা-সিদ্ধির বহু বিলম্ব, হয় ত তাহার বাসনা পূর্ণ না হইতেও পারে। তখন সে অন্য পথ অবলম্বন করিল। তাহার একটা মহলের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া দুই বৎসর খাজনা বন্ধ করিয়াছিল; নায়েবেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারে নাই। যশোদালাল নরেশকে এই বিদ্রোহী মহলে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় করিল। নরেশকে কোন স্থানে বদলী করিলে সে হয় ত যাইতে চাহিবে না, অথবা পরিবার লইয়া যাইতে চাহিবে; তাহা হইলে যশোদালালের বাসনা পূর্ণ হয় না। তাই সে অল্প কিছু দিনের জন্য নরেশকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিল। একদিন নরেশকে ডাকিয়া তাহার এই অভিপ্রায় তাহাকে জানাইল এবং তাহাকে যে দীর্ঘকাল বাড়ী ছাড়িয়া থাকিতে হইবে না, এ আশ্বাসও দিল। নরেশ কি করিবে; সে চাকর, মনিবের আদেশ তাহাকে পালন করিতেই হইবে, নতুবা চাকরী ত্যাগ করিতে হয়। বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক কেহ নাই, এই কারণ প্রদর্শন করিলে যশোদালাল সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল—„আরে, তোমার ভাবনা কি? আমি প্রতিদিন তোমার বাড়ীর খবর নেব; তুমি বাড়ী থাক্‌লে তোমার মা কি তোমার স্ত্রীর যে রকম তত্ত্বাবধান হোতো, তোমার অনুপস্থিতি সময়ে তার চাইতে বেশী ভিন্ন কম হইবে না; এ কথা কি তুমি বিশ্বাস করতে পার না? তোমার মা, তোমার স্ত্রী কি আমার

আপনার জন নয় ?" সুতরাং নরেশকে বাধ্য হইয়া বিদ্রোহী মহলে যাইতে হইল এবং যশোদালাল তাহার মাতা ও স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিল।

তাহার পর দুই মাসের মধ্যে কি ঘটনা হইল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে এ বৃদ্ধ লেখক অসমর্থ। মানুষ কেমন করিয়া প্রলুব্ধ হইয়া ধীরে ধীরে নরকের পথে অগ্রসর হয়, সয়তান-রূপী যুবক কেমন করিয়া সুন্দরী যুবতীকে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত করে, তাহার ইতিহাস আর বলিয়া কাজ নাই, পাঠকগণেরও শুনিয়া কাজ নাই। একদিন গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে নরেশের স্ত্রী কুলত্যাগ করিয়াছে,—কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কে এ কাণ্ডের নায়ক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল; কিন্তু যশোদালাল দুর্গার গৃহত্যাগের দিন হইতে পাঁচ সাত দিন কোথাও গেল না, বাড়ীতেই রহিল এবং নরেশের স্ত্রীর কুলত্যাগের জন্য সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত হইল। সে মহা কোলাহল জুড়িয়া দিল; এবং যে ব্যক্তি এমন দুষ্কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সে বড় বড় প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল। দুর্গার অনুসন্ধানের জন্য, ঠিক পথ ছাড়া অন্য যত পথ আছে, সব পথে লোক পাঠাইতে লাগিল। সংবাদ পাইয়া নরেশ বাড়ীতে আসিল। যশোদালালই সর্ব্বাগ্রে তাহার সহিত দেখা করিয়া তাহার এই গভীর মর্ম্মবেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিল। গ্রামের দশজন তোষামোদকারী বলিল যে, যশোদাবাবু এই ঘটনার পর হইতে যাহা করিয়াছেন, কোন মনিব কোন চাকরের জন্য তা করে না; নরেশের এই কলঙ্কে যশোদালাল যে

বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছে, এ কথা সে সহস্র রকমে নরেশকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নরেশ এবার ঠিক কথা বুঝিল; তাহার মাতাও তাহাকে সেই কথা বুঝাইল। নরেশ তখন জমিদারের চাকরী ত্যাগ করিয়া, বাড়ীঘর দ্বার বিক্রয় করিয়া, যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহা লইয়া মাতাকে সঙ্গে করিয়া কাশী চলিয়া গেল। যশোদালাল অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে দেশে রাখিতে পারিল না।

দুর্গা যশোদালালের আশ্রয়ে কলিকাতায় দুই তিন বৎসর ছিল; তাহার পর একে-একে অনেক 'লাল' আসিল, অনেক 'লাল' গেল। অবশেষে যৌবনের প্রায়াবসান-সময়ে সে ধাপে-ধাপে নীচে নামিয়া হরিশ ভাণ্ডারীর আশ্রয় লাভ করিল। তাহার পর কি হইল, তাহা ত এই গল্পেই প্রকাশ।

[১৭]

দুই চারিবার যাতায়াতেই মেসের সকল ছাত্রের সহিতই হরিশের পরিচয় হইয়া গেল। হরিশ যে ভাণ্ডারীর কায করে, এ কথা শুনিয়াও ছাত্রদের মধ্যে কেহই তাহাকে অবজ্ঞা করিত না, বরঞ্চ তাহার মহত্ত্ব দেখিয়া, তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, সকলেই তাহার অনুরক্ত হইল। হরিশ মেসের সকলেরই হরিশ কাকা হইয়া পড়িল। সে যে-দিন মেসে আসিত, সেদিন সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিত; তাহার সহিত কথা বলিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ অনুভব করিত; তাহার অমায়িক ব্যবহারে মেসের ছাত্রেরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

মেসে ১৪ জন ছাত্র ছিল; সকলেরই বাড়ীই পূর্ব্ববঙ্গে। ছেলে-

গুলি যেন এক সুরে বাঁধা ; পড়াশুনা এবং পরীক্ষায় পাশ করা ব্যতীত তাহারা অন্য কোন কথা মনেই আনিত না। এখানকার মত, সে সময় এত বেশী থিয়েটার ছিল না ; বায়স্কোপের অস্তিত্বও তখন কলিকাতায় অজ্ঞাত ছিল। ক্রিকেট খেলা একটু আধটুকু চলিত, কিন্তু ফুটবল, হকি তখনও সমুদ্র পার হইয়া এ দেশে পৌঁছে নাই। তবে তখন সভাসমিতিতে বক্তৃতা শুনিবার একটা আগ্রহ স্কুল কলেজের ছেলে-মহলে খুব ছিল; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার জন্য ছেলেরা বাগবাজার হইতে পদব্রজে ভবানীপুর পর্য্যন্তও যাইত। কিন্তু এ মেসের নিয়ম ছিল যে, দীর্ঘ অবকাশের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় মেসের কোন মেম্বর কোন সভাসমিতিতে পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে না। মেসের অন্যান্য ব্যবস্থাও ভাল ছিল। ছাত্রগণের মধ্যে সকল অবস্থারই লোক ছিল;কিন্তু আহার সম্বন্ধে কোন প্রকার ইতর-বিশেষ ছিল না ; সকলে যখন একসঙ্গে আহারে বসিত, তখন কেহ পৃথক করিয়া নিজের পয়সায় কিছু আনিয়া খাইতে পারিত না। বাসা-খরচ, বাড়ীভাড়া প্রভৃতিতে সে সময় এই মেসে আট নয় টাকার বেশী পড়িত না। সুতরাং পরেশ এ মেসে আসিয়া নিজের দীনতা একদিনও অনুভব করিতে পায় নাই। সে দেখিত,মেসের বড় ছোট সকলেই তাহাকে সমান ভাবে আদর করিয়া থাকে। তাহার একটা বড় ভয় ছিল, সামান্য একজন ভাণ্ডারী তাহার খরচ দেয়, তাহাকে সে কাকা বলিয়া ডাকে ; ইহাতে হয় ত অন্য ছাত্রেরা তাহাকে ঘৃণা করিবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবে, হয় ত মেসের বড়মানুষের ছেলেরা

হরিশ কাকার সহিত ভাল ব্যবহার করিবে না। তাহা হইলে যে তাহার মনে বড়ই কষ্ট হইবে। সে মেসে আসিবার সময় মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, তাহার হরিশ কাকাকে সে মেসে আসিতেই দিবে না; তাহার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, নিজে আড়তে যাইয়া তাহা লইয়া আসিবে! কিন্তু তাহাকে কিছুই করিতে হইল না; হরিশ তাহার অমায়িক ব্যবহারে মেসের ছোট বড় সকলকেই আপনার ছেলের মত করিয়া লইল, সে যে একটা আড়তের সামান্য ভৃত্য, সে কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। যে দিন হরিশ মেসে আসিত, সে দিন তাহাকে লইয়া সকল ছাত্র একটা আনন্দের হাট বসাইত। হরিশও কোন দিন রিক্তহস্তে আসিত না। পূর্ব্বে যে দিনের কথা বলিয়াছি, সে দিন মেসের দুই একটী ছেলের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল; তাহার পর যখন সকলের সহিত তাহার জানাশুনা হইল যখন সে সকল ছাত্রেরই 'হরিশ কাকা'র পদে অধিষ্ঠিত হইল, তখন সে ত শুধু পরেশ ও অমরের জন্যই কিছু হাতে করিয়া আনিতে পারে না! ছিঃ, সে কি ভাল দেখায়। তাহার মনে হইল, তাহার কাছে যেমন পরেশ, অমর, তেমনই আর সব ছেলে,—সবাই যে তাহার ছেলে—সে যে সকলেরই কাকা! সেইজন্য সে যে-দিন মেসে আসিত, সেই দিনই এই চোদ্দজন ছেলের উপযুক্ত কিছু না কিছু লইয়া আসিত। ছেলেরা কিন্তু ইহাতে ভয়ানক আপত্তি করিত। এক রবিবারে হরিশ অসময়ে—বেলা আটটার সময়, প্রকাণ্ড একটা মাছ লইয়া মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেরা সকলেই তখন মেসে ছিল। বামুন-ঠাকুর মাছ দেখিয়া

যখন উচ্চৈঃস্বরে বলিল "মোহিত বাবু, এই দেখুন এসে, হরি ঠাকুর কি কর্ম্ম করেছেন" তখন দোতলা হইতে সকলেই নীচে নামিয়া আসিল; অমর ও পরেশও সে সঙ্গেই আসিল। মাছ দেখিয়া ম্যানেজার মোহিত বলিল "না হরিশ কাকা, আমরা কিছুতেই তোমার মাছ নেব না,—কিছুতেই না। কেন বল দেখি তুমি অকারণ টাকা খরচ কর। যখনই মেসে এস, তখনই কিছু না কিছু খাবার নিয়ে এস। কতদিন বলেছি কাকা, এমন আর কোরো না। আজ দেখ ত, এত বড় একটা মাছ নিয়ে এসে বসেছ।" হরিশ হাসিতে হাসিতে বলিল "তাতে কি হয়েছে! আমার ইচ্ছা হল, আমি নিয়ে এলাম।" ঝিয়ের দিকে চাহিয়া বলিল "ও বিন্দু, চেয়ে দেখ্‌চিস কি মা, মাছটা কুটে ফেল।" নরেন্দ্র নামে একটি ছেলে ছিল; সে বি-এ পড়ে। সে বলিল "হরিশ কাকা, ম্যানেজার রাগছে কেন জান? তুমি ত মাছ দিয়ে খালাস, ওকে যে এখনই আর দুই তিনটে টাকা খরচ করতে হবে, তা বুঝেছ?" মোহিত বলিল "সে ত ঠিক কথা।" অমর বলিল "আচ্ছা ম্যানেজার, একটা কাজ করা যাক্! এই মাছ উপলক্ষ্য করে আজ তোমার যা খরচ হবে, তা আমরা সকলে মিলে চাঁদা করে দিই—পরেশ অবশ্য বাদ।" নরেন্দ্র বলিল "তা বেশ, কিন্তু পরেশ বাদ যাবে কেন?" অমর বলিল "পরেশই ত মাছ দিল—তার কাকাই ত মাছ এনেছে।" মোহিত বলিল "কেন? হরিশ কাকা কি শুধু পরেশেরই কাকা? হ্যাঁ, হরিশ কাকা, তুমি কি পরেশেরই কাকা, আমাদের নও।" হরিশ বলিল "এই শোন কথা। ওরে বাবারা, আমি তোমাদের সকলেরই

বুড়ো ছেলে। তোরা সবাই যে আমার বাপ! সবাই আমার ঠাকুর। আমি যে এক পরেশ দিয়ে এতগুলো পরেশপাথর পেয়েছি। ঠাকুর যে আমার চাঁদের হাট বসিয়ে দিয়েছেন। তা, এক কথা শোন। তোমাদের চাঁদাটাঁদা করতে হবে না; সে সব আমার উপর ভার। ও ঠাকুর মশাই, তুমি এ-বেলা মাছগুলো ভেজে রেখে দেও। আর কিছু তোমাকে এখন করতে হবে না। আমি দুপুরের পর এসে আর সব ব্যবস্থা করে দেব এখন। তোমাদের বাবা, কিছু ভাবতে হবে না।"

মোহিত বলিল "এই শোন কথা। তোমার কি মতলব খুলে বল না হরিশ কাকা?"

হরিশ বলিল "মতলব আবার কি? শোন, কাল রাত্রে আমাদের আড়তের একজন ব্যাপারী বাড়ী চলে গেল। সে এবার অনেক লাভ করেছে; তাই যাবার সময় পনরটী টাকা দিয়ে গেল। আমি ভাবলাম, বেশ হোলো, এই টাকা কয়টী আমি আমার গোপালদের সেবায় লাগিয়ে দিই। তাই আজ সকালে উঠেই চার টাকা দিয়ে এই মাছটা কিনে নিয়ে এসেছি। এখন আর যা-যা লাগে, সে সব আমি ও-বেলার ঠিক করে দিয়ে যাব।"

নরেন্দ্র বলিল "হরিশ কাকা, এই চোদ্দটী পাষণ্ডই বুঝি এত বুড়ো বয়সে তোমার গোপাল হল।"

হরিশ বলিল "বাবা, সে কথা তুমি এখন বুঝবে না। আমি কত ঠাকুর-দেবতার বাড়ীতে কত জিনিস দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের জন্য যখন যা সামান্য কিছু এনে দিয়েছি, আর

তোমরা সবাই হাসিমুখে হাতে করে নিয়ে খেয়েছ, তখন আমার সত্যিসত্যিই মনে হয়েছে, আমি আমার গোপালকে খাওয়াচ্ছি। ঠাকুরবাড়ী দিয়ে ত কখনও এমন মনে হয় নি বাবা! যাক্ সে সব কথা এখন থাক। ও বিন্দু, তুমি মা আর দাঁড়িয়ে থেক না; মাছটা কুটে ফেল। আর আমি দাঁড়াতে পরেছি নে। আর দেখ, এই টাকাটা রাখ; তেল এনে দিও। মাছ ত ভেজে রাখতে হবে।"

মোহিত বলিল "দেখ হরিশ কাকা, তোমার কি টাকা রাখবার স্থান নেই, কেন অকারণ কতকগুলো টাকা খরচ করবে বল ত?"

হরিশ বলিল "যখন হরিশের মত তোমাদের বয়স হবে, আর তোমাদের মত ছেলে হবে, তখন তা বুঝতে পারবে।"

অমর বলিল "তা হলে হরিশ কাকা, তুমি ও-বেলা এখানেই খাবে, কেমন?"

হরিশ বলিল, "আমি ত মাছ খাই নে। আমার খাবার কি। আমি ও-বেলা এসে সব ঠিক করে, তোমাদের খাইয়ে-দাইয়ে তারপর আড়তে যাব; আমি ও-বেলায় ছুটি করে আসব। এখন বেলা হয়ে গেল, আমি আর দেরী করতে পারছিনে।" এই বলিয়া হরিশ চলিয়া গেল।

তিনটার সময় হরিশ মুটের মাথায় নানা দ্রব্য বোঝাই দিয়া মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর আর কি—হরিশ নিজে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিল। রাত্রি দশটার

পর সকলের আহার শেষ হইয়া গেল, হরিশ আড়তে যাইবার জন্য মেস হইতে বাহির হইল।

পথে যাইতে যাইতে তাহার মনে হইল, এই সংবাদটা রাত্রি-তেই দুর্গাকে দিয়া যাইবে ; দুর্গা শুনিলে কত খুসী হইবে। সে তখন বরাবর আড়তে না যাইয়া দুর্গার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। দুর্গা তখন দাবার বসিয়া মালা হাতে করিয়া হরিনাম করিতে ছিল। হরিশকে দেখিয়াই মালাটি কপালে ঠেকাইয়া বলিল "কি, হরি ঠাকুর, এত রাত্রে কোথা থেকে ?"

হরিশ বলিল "পরেশদের দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।"

"পরেশকে, এত রাত্রে ! সে ভাল আছে ত ?"

হরিশ হাসিয়া বলিল "ভয় নেই, পরেশ ভালই আছে। তাদের আজ একটা খাওয়া-দাওয়া ছিল, তাই দেখাশুনা করতে গিয়েছিলাম।"

"তাই বল যে, তোমার সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল ?"

"ঠিক বলেছ দুর্গা, আজ তাদের বাসায় আমার নিমন্ত্রণই ছিল। এতটা বয়স হয়েছে, অনেক খেয়েছি, কিন্তু তোমার বল্‌তে কি দুর্গা, এমন নিমন্ত্রণ কখন খাই নি।"

দুর্গা বলিল, "কি রকম শুনি দেখি। তোমার মুখে যে আর প্রশংসা ধরছে না। এমন কি খেলে, যা কোন দিন খাও নি।"

হরিশ একখানি আসন টানিয়া লইয়া উপবেশন পূর্ব্বক বলিল "দুর্গা, পেটে খাওয়াই কি খাওয়া ! আজ পরেশের বাসার সকলে যে কি আনন্দ করে খাওয়া-দাওয়া করল, কি যে তাদের হাসিমুখ,—দেখেই আমার প্রাণ ভরে গেল। তারা যখন খেতে

লাগল; 'হরিশ কাকা, এটা দেও, ওটা দেও, আমাকে দেও' বলে স্যোরগোল করতে লাগল, আমার তখন মনে হোল বৃন্দাবনে রাখাল্-বালকেরা উৎসব করছেন, আর আমার মত পাপীর কাছে হাত পেতে খেতে চাচ্ছেন। দুর্গা, সে আনন্দ, সে শোভা, যদি আজ দেখতে, তোমার চোখ জুড়িয়ে যেত। সেই কথা বল্‌তেই তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম।"

দুর্গা বলিল "আজ তাদের কি ব্যাপার ছিল?"

"ব্যাপার কিছুই নয়। কাল রাত্রে একটা ব্যাপারী আমাকে পনরটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা হোলো, ঐ টাকা কয়টা দিয়ে পরেশের বাসার সকলকে খাইয়ে দিই। তাই আজ সকালে একটা মাছ কিনে দিয়ে এসেছিলাম; তারপর দুপুরবেলা গিয়ে সব ব্যবস্থা করে তাদের খাইয়ে, এই ফিরে আস্‌ছি।"

দুর্গা বলিল "বেশ করেছ, হরি ঠাকুর, তোমার মত কাজই করেছ। আমার অদৃষ্টে নেই, আমি দেখতে পেলাম না। দেখ, আমারও ইচ্ছে করে, আমি একদিন ওদের অমনি করে খাওয়াই। তা কি আর আমার অদৃষ্টে হবে! পরেশকে ছেলেরা যে রকম ভালবাসে, তাতে ওদের যত্ন করতেই ইচ্ছে করে। আমার অদৃষ্টে ত তা আর নেই। তারা ভদ্রলোকের ছেলে, আমার বাড়ীতে তারা আসবেই বা কেন, আর আমিই বা সে সাহস করব কি করে।" এই বলিয়া দুর্গা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

হরিশ বলিল "দুর্গা, তুমি মনে কষ্ট কোরো না; আমি যেমন করে পারি, তোমার এ ইচ্ছা পূর্ণ করব। এখন তা হ'লে যাই।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।" এই বলিয়া হরিশ আড়তে চলিয়া গেল।

[১৮]

আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসর শীতকালের প্রারম্ভে কলিকাতা সহরে ভয়ানক বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। আজকালকার মত তখন সহরের এমন সুব্যবস্থা ছিল না; কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে,মিউনিসিপ্যালিটী হইতে রোগ নিবারণ বা প্রশমনের জন্য উপায় অবলম্বিত হইত না।

যখন বসন্ত আরম্ভ হইল, তখন যাহাদের মফস্বলে বাড়ীঘর ছিল, তাহারা দেশে পলায়ন করিল; আর যাহারা অনন্যগতি তাহারা ভয়ে-ভয়ে কলিকাতাতেই বাস করিতে লাগিল। যাহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তাহারা বাঁচিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু অনেকেই মারা যাইতে লাগিল।

স্কুল-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ স্কুল কলেজ বন্ধ করিয়া দিলেন; ছাত্রেরা দেশে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। পরেশদের মেসের ছেলেরা মেস বন্ধ করিয়া যে যাহার বাড়ীতে যাওয়ার ব্যবস্থা করিল। পরেশকে বাড়ী যাওয়ার কথা বলায় সে বলিল "বাড়ীতে কোথায় যাব? আমার ত বাড়ী নেই।"

অমর বলিল"ভাই পরেশ, তুমি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী চল।" এই সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে হরিশ মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার আজ পাঁচদিন জ্বর। সে এই পাঁচদিন পরেশের খোজ লইতে পারে নাই; এমন লোকও তাহার হাতে

ছিল না, যাহাকে পাঠাইয়া পরেশের সংবাদ লয় বা এই ঘোর বিপদের সময় তাহার জন্য কোন ব্যবস্থা করে।

সে দিন কিন্তু সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। জ্বর নিতান্ত সামান্য নয়, চারিদিন লঙ্ঘন দেওয়ায় তাহার শরীরও বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আড়তের সকলেই মনে করিয়াছিল, তাহার বসন্ত হইবে। এই জ্বর-গায়ে, দুর্ব্বল শরীরে হরিশ মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কি এ সময়ে শুইয়া থাকিতে পারে; পরেশের রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা সে না করিলে আর কে করিবে?

সেই বেলিয়াঘাটার আড়ত হইতে যুগলকিশোর দাসের লেন নিতান্ত কম পথ নহে। হরিশ এই দীর্ঘ পথ ধীরে-ধীরে হাঁটিয়াই আসিয়াছে। দুর্ব্বল শরীরে এ পথশ্রম সহিবে কেন। হরিশ অতি কষ্টে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিয়া, পরেশ ও আর সকলে যে ঘরে বসিয়া কলিকাতা-ত্যাগের আলোচনা করিতেছিল, সেই ঘরের সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া কি হইল, কি হইল, বলিয়া ঘরের মধ্য হইতে সকলে দৌড়িয়া দ্বারের কাছে আসিল।

পরেশ একেবারে হরিশকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "ও কাকা, তুমি অমন করছ কেন?" তখনই চীৎকার করিয়া উঠিল "অমর, কাকার যে গা পুড়ে যাচ্ছে, খুব জ্বর হয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া অমর ও আর দুই তিন জন হরিশের কাছে বসিয়া পড়িল। হরিশের তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না; সে দেওয়ালে মাথা দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিল। সকলে ধরা-

ধরি করিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া একটা বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল। হরিশের তখন সংজ্ঞা লোপ হইয়াছে।

সকলেই 'কি হইল' বলিয়া মহা সোরগোল লাগাইয়া দিল। ম্যানেজার মোহিত আর একটা ঘরে ছিল। এই গোলযোগ শুনিয়া সেখানে আসিয়া বলিল "ব্যাপার কি? হরিশ কাকা অমন করে শুয়ে কেন? কি হয়েছে? তোমরা একটু থাম না; সবাই মিলে চেঁচালে যে হরিশ কাকা এখনই মারা যাবে?"

পরেশ মোহিতের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতরস্বরে বলিল "মোহিত বাবু, আমার কাকাকে বাঁচান। কাকা যে কেমন হয়ে পড়ল?"

মোহিত বলিল "ভয় কি? জ্বর হয়েছে, তারপর এতটা পথ এসেছে। একটু জল আন, চোখে-মুখে দিই। তোমরা একজন বাতাস কর ত!"

চোখে-মুখে জল দিয়া এবং বাতাস করিয়াও যখন হরিশের জ্ঞানসঞ্চারের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন মোহিত বলিল "আর ত বিলম্ব করা উচিত নয়। অমর ভাই, তুমি বেরিয়ে পড়। যেখানে ডাক্তার পাও, সঙ্গে করে নিয়ে এস, বিলম্ব কোরো না।"

অমর তখন ডাক্তার আনিতে বাহির হইয়া গেল। আর সকলে যাহা পারে, করিতে লাগিল।

পনর মিনিট পরেই অমর একজন বড় ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাবু রোগীকে পরীক্ষা করিয়া মলিন মুখে বলিলেন "এর যে বসন্ত হয়েছে। গায়ে বাহির হয় নাই, ভিতরে রয়েছে। রক্ষা পাওয়ার আশা নেই। গায়ে বেরুলে

চেষ্টা করে দেখতে পারা যেত, suppressed Pox অতি ভয়ানক। এ রকম কেশ প্রায়ই fatal হয়। দেখা যাক্। আমি দুইটা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, এর একটা দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবে; আর একটা যে ওষুধ দিচ্ছি, তাতে নেকড়া ভিজিয়ে ক্রমাগত সর্ব্বাঙ্গে লাগাতে হবে। যদি আজকার রাত্রের মধ্যে বসন্ত বাহির হয়, তা হলে চিকিৎসার ধারা পাওয়া যাবে; নইলে আর উপায় নাই। কিন্তু তোমরা ত দেখ্‌ছি সবাই কলেজের ছেলে; তোমাদের ত এ রোগীর কাছে থাকা উচিত নয়। তোমাদের এখন কল্‌কাতাতেই থাকা ঠিক নয়। ইনি তোমাদের কারুর আত্মীয় কি?"

পরেশ বলিল "ইনি আমার কাকা।"

ডাক্তার বলিলেন "আমার পরামর্শ এই যে, এঁকে তোমরা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেও। এখানে রেখে সেবাশুশ্রূষা কোন রকমেই হবে না; তোমাদের তা করাও উচিত নয়! এখনই একখানা গাড়ী ডেকে এঁকে হাসপাতালে রেখে এস, তারপর তোমরা সবাই দেশে চলে যাও; এখানে আর কেউ থেক না।"

অমর বলিল "সে আমরা কিছুতেই পার্‌ব না; হরিশ কাকাকে হাসপাতালে মর্‌তে কিছুতেই দিব না; আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখ্‌ব। তাতে যদি আমাদের বসন্ত হয়ে মর্‌তে হয়, সেও ভাল।"

ডাক্তার বাবু অবাক্ হইয়া ছেলেদের কথা শুনিলেন; এমন কথা ত তিনি কখন শোনেন নাই। তিনি এই কলিকাতা সহরে অনেক বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

অনেক স্থানেই দেখিয়াছেন, রোগীর নিতান্ত আপনার জন দুই একটী ব্যতীত আর কেহ রোগীর ঘরেও আসিতে সাহস করে না, শুশ্রূষা করা ত দূরের কথা। আর এই ছেলেরা বলে কি যে, তাহারা এই লোকটির জন্য প্রাণপণ করিবে!

তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন "ইনি শুনলাম ঐ ছেলেটীর কাকা, কিন্তু, তোমরা সবাই এঁর জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন? আমি ত কিছু—"

ডাক্তার বাবুর কথায় বাধা দিয়া অমর বলিল "ইনি শুধু পরেশের কাকা নন, আমাদের সকলেরই কাকা। ইনি দেবতা, এঁর মত মানুষ আমরা কখন দেখি নাই।" এই বলিয়া হরিশের সমস্ত পরিচয় ডাক্তার বাবুকে দিল। ডাক্তার বাবু এই সকল কথা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন. "দেখ আর বিলম্ব করে কাজ নেই। তোমরা একজন আমার সঙ্গে এস, এখনই ওষুধ দিচ্ছি। তারপর দেখা যাক্ কি করতে পারা যায়। আমি আবার সন্ধ্যার সময় আসব। আমাদের scienceএ যা করতে পারে, আমি এঁর জন্য তার ত্রুটি করব না?"

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমর তখন ষোলটী টাকা ডাক্তার বাবুর হাতে দিতে গেল। ডাক্তার বাবু হাত সরাইয়া লইয়া বলিলেন "টাকা! আমি একটি পয়সাও চাই না; যতবার দরকার হয়, ততবার আমি আসব। তোমরা যদি এমন মহাত্মার জন্য প্রাণপণ করতে পার, আমি কি পারি না? আমিও ত মানুষ। আমিও ত তোমাদের মত একদিন ছাত্র

ছিলাম। কিন্তু বল্‌তে কি, তোমাদের মত এমন ছাত্র আমি কখন দেখি নি। আমার যেন মনে হচ্চে, এত চেষ্টা এত যত্ন, এত প্রাণপাতের পুরস্কার নিশ্চয়ই আছে। ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের মনে কষ্ট দিবেন না। আর বিলম্ব করে কাজ নেই। কে আমার সঙ্গে যাবে চলে।"

অমর ডাক্তার বাবুর সহিত ঔষধ আনিতে চলিয়া গেল; হরিশ সেই সংজ্ঞাশূন্য অবস্থাতেই রহিল।

[১৯]

ডাক্তার ও অমর চলিয়া গেলে পরেশ আর সকলকে বলিল "দেখুন আপনারা কাকার জন্য যা করছেন, সে কথা আর বল্‌ব না। আমার একটা প্রার্থনা আছে।"

মোহিত বলিল "কি তোমার কথা পরেশ? তুমি কি দেশী চিকিৎসা করাতে চাও?"

পরেশ বলিল "না, আমি সে কথা বল্‌ছি নে; চিকিৎসার আমি কি জানি। কিন্তু ডাক্তার বাবু বলে গেলেন, কাকার বসন্ত হয়েছে। বসন্ত রোগীর কাছে থাক্‌লে সকলেরই ঐ ব্যারাম হ'তে পারে; হয়-ও। আপনারা সকলে কাকার জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করবেন কেন? আমি তাই বলি, আপনারা যা স্থির করেছিলেন, তাই করুন। সবাই বাড়ী যান, এখানে আর থাক্‌বেন না। আমি কাকার সেবা করি। আরও একজন আছেন, তাঁকে খবর দেওয়া দরকার; কিন্তু আমি সাহস করে সে কথাটা আপনাদের কাছে বল্‌তে পার্‌ছি নে।"

মোহিত বলিল "এমন কি কথা পরেশ, যা তুমি বল্‌তে এত সঙ্কুচিত হচ্চ? এ কি সঙ্কোচের সময় ভাই? আর কে হরিশ কাকার আছে, বল, তাঁকে এখনই সংবাদ পাঠাই।"

পরেশ বলিল "আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে বল্‌তে পারি।"

মোহিত বলিল "তুমি পাগল হয়েছ না কি পরেশ! হরিশ কাকা এখন মৃত্যুমুখে, এ সময় তোমার কোন সঙ্কোচের কারণ নেই। তোমার কথাটা কি শীঘ্র বল।"

পরেশ বলিল "দেখুন, হরিশ কাকা অনেক দিন থেকে একটা স্ত্রীলোককে রেখেছিল। আমি তাকে মাসী বলে ডাকি। সে আমাকে ছেলের মত ভালবাসে। কাকাকেও সে এখন আর পূর্ব্বের মত দেখে না; সে কাকাকে এখন ভক্তি করে। তাকে দেখলে, তার ব্যবহার দেখ্‌লে আপনারা কিছুতেই মনে করতে পারবেন না যে, সে একদিন কুপথে গিয়েছিল। তাকে দেখ্‌লেই এখন ভক্তি হয়। আপনারা যদি বলেন, আপনারা যদি ঘৃণা না করেন, তা হলে মাসীকে খবর দিই। সে এলে আর কাউকে কিছু করতে হবে না; সে প্রাণ দিয়ে কাকার সেবা করবে। আর তাতে—"

পরেশের কথায় বাধা দিয়া মোহিত বলিল "আমি বুঝেছি পরেশ! তোমাকে সে জন্য কোন ভয় করতে হবে না। আমরা কিছুই মনে করব না। তুমি এখনই যাও। একখানি গাড়ী করে তাঁকে নিয়ে এস। এখানে কেউ তাঁর উপর কোন অসম্মান প্রকাশ করবে না, এ কথা আমি তোমাকে বলে

দিচ্ছি। আর বিলম্ব করো না পরেশ। তুমি তাঁর বাড়ী চেন ত ?"

পরেশ বলিল "আমি সে বাড়ী চিনি। আমি কতদিন গিয়েছি। মাসী যে আমাকে কত ভালবাসে, তা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

মোহিত বলিল "সে কথা পরে হবে। তুমি এখনই যাও। একেবারে গাড়ী নিয়ে যাও।"

পরেশ আর বিলম্ব না করিয়া দুর্গাকে আনিবার জন্য তখনই চলিয়া গেল।

[২০]

পরেশ যখন মেস হইতে বাহির হইল তখন বেলা প্রায় চারিটা। সে একবার মনে করিল একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাড়াতাড়ি দুর্গার বাড়ীতে যাইবে ; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, আর কাহার ভরসায় সে এখন পয়সা খরচ করিতে সাহস করিবে। তাহার কাকা কি আর বাঁচিবে ? তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এবারে বসন্ত রোগে অনেকেই মারা যাইতেছে ; তাহার কাকাও মারা যাইবে। হায় ভগবান, এ কি করিলে ? তাহার যে ঐ কাকা ভিন্ন জগতে আর কেহ নাই। সে যে ঐ হরিশ কাকার উৎসাহেই, হরিশ কাকার সাহায্যেই কলেজে পড়িতেছে। পথে চলিতে চলিতে সুধুই তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার হরিশ কাকার আর নিস্তার নাই। পরেশ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে চায়, কিন্তু তাহার পা যেন চলিতে চায় না, তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

অতি কষ্টে সমস্ত পথ চলিয়া যখন দুর্গার বাড়ীর নিকটে সে উপস্থিত হইল, তখন তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। এ দুঃসংবাদ সে কেমন করিয়া দুর্গাকে বলিবে! এ সংবাদ শুনিয়া দুর্গার কি অবস্থা হইবে, তাহাই ভাবিয়া পরেশ ব্যাকুল হইয়া পড়িল; তাহার পদদ্বয় আর অগ্রসর হইতে চাহে না; সে তখন পথের পার্শ্বে একটা বাড়ীর দেওয়াল অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিতে লাগিল, "মাসীর কাছে কেমন করিয়া কথাটা বলিব?"

দুই তিন মিনিট সে সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে হুঁস হইল যে, সে যত বিলম্ব করিবে, তাহার হরিশ কাকার জীবনের আশা ততই কম হইবে। দুর্গাকে এখনই লইয়া যাইতে হইবে; আর একটু বিলম্ব করাও কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।

তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, এতক্ষণের মধ্যে তাহার হরিশ কাকার যদি কিছু হইয়া থাকে। সে শিহরিয়া উঠিল! হায় হায়, কেন হরিশ কাকাকে ফেলিয়া আসিলাম। ফিরিয়া গিয়া যদি তাহাকে আর জীবিত দেখিতে না পাই! না না, আর বিলম্ব নয়।

পরেশ তখন পাগলের মত ছুটিয়া দুর্গার দুয়ারের নিকট গেল। দুয়ার ভিতর দিকে বন্ধ ছিল। পরেশ বাহিরের কড়া নাড়িয়াই দুয়ারের গোড়ায় বসিয়া পড়িল; তাহার দাঁড়াইয়া থাকিবার সামর্থ্য ছিল না।

দুর্গা বাড়ীর মধ্যে কি কাজে ব্যস্ত ছিল; তাই দুয়ারের কড়া নাড়িবার শব্দ শুনিতে পায় নাই; পরেশ যদি জোরে কড়া নাড়িত, তাহা হইলে একবার নাড়িলেই শব্দ শুনিতে পাওয়া

যাইত; কিন্তু পরেশ অতি মৃদুভাবে কড়া একবার নাড়িয়াই দুয়ারের গোড়ায় বসিয়া পড়িয়াছিল; দুর্গা সে শব্দ মোটেই শুনিতে পায় নাই; সুতরাং দুয়ার খুলিয়া দিবারও তাহার প্রয়োজন হয় নাই।

প্রায় এক মিনিট পরেও যখন দুর্গা দুয়ার খুলিল না, তখন পরেশ বুঝিতে পারিল যে, দুর্গা কড়া নাড়িবার শব্দ শুনিতে পায় নাই। সে তখন উঠিয়া একটু জোরে কড়া নাড়িবামাত্র ভিতর হইতে দুর্গা বলিয়া উঠিল "কে?"

পরেশ এই শব্দ শুনিয়াও সাড়া দিতে পারিল না। বাহিরে কেহ সাড়া দিল না দেখিয়া দুর্গা মনে করিল, তাহার হয় ত শুনিতে ভুল হইয়াছে; এ হয় ত অন্য শব্দ। সে দ্বার খুলিল না।

পরেশ তখন আবার কড়া নাড়িল। এবার দুর্গা আসিয়া দুয়ার খুলিয়াই দেখে পরেশ মলিন মুখে দাঁড়াইয়া আছে। পরেশকে দেখিয়াই দুর্গা বলিল "পরেশ; তুমি কড়া নাড়িয়াছিলে? আমি যে সাড়া দিলাম, তুমি ত জবাব দিলে না। ও কি, তোমার মুখ অমন শুকিয়ে গেছে কেন? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?" এই বলিয়া দুর্গা পরেশের হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিল।

পরেশ যে কি বলিবে, কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না। দুর্গা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া "বাবা, তুমি অমন করছ কেন? কোন অসুখ করেছে?" এই বলিয়া পরেশের কপালে হাত দিল।

এই স্নেহের স্পর্শে পরেশ আত্মহারা হইয়া গেল; সে কাঁদিয়া বলিল "মাসীমা, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

"সর্ব্বনাশ! কি হয়েছে পরেশ! শীগ্‌গির বল কি হয়েছে?"

পরেশ বলিল "কাকার বসন্ত হয়েছে।"

"বসন্ত! য়্যাঁ—বসন্ত!" দুর্গা আর কথা বলিতে পারিল না, সেখানেই বসিয়া পড়িল।

পরেশ তাড়াতাড়ি দুর্গার কাছে যাইয়া বলিল "মাসীমা, তুমি অত কাতর হলে ত কাকাকে বাঁচাতে পারব না। এখন তুমিই একমাত্র ভরসা। আর দেরি কোরো না, ঘর-দুয়ার বন্ধ করে চল।"

দুর্গা বলিল "যাব! কোথায় যাব? আড়তে গেলে তারা কি আমাকে ঢুকতে দেবে। বাবা, তুমি অতদূর থেকে খবর পেলে, আর আমি কোন খবরই পেলাম না। কবে বসন্ত হোলো? কবে জ্বর হয়েছিল? আমি ত কিছুই জান্‌তে পারিনি। তুমি ছেলেমানুষ; তুমি সব কথা না ভেবেই আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে এসেছ। আমি আড়তে যাব কি করে? তাই ত, কি হবে বাবা পরেশ! দেখ, তুমি এক কাজ কর। তুমি হরি ঠাকুরকে এখানে নিয়ে এসো; তাতে আড়তের লোক নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। বসন্তের রোগী, তারা বিদেয় করতে পারলেই বাঁচে। বাবা, তুমি চুপ করে বসে থেকো না, যাও।"

পরেশ বলিল "মাসী-মা, তুমি ব্যস্ত হোচ্চ কেন? কাকা আড়তে নেই, আমাদের মেসে গিয়েছে। আমি তোমাকে মেসে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"তোমাদের বাসায় সে কবে গেল?"

পরেশ বলিল "আজই গিয়েছে,—এই ঘণ্টা দুই তিন আগে।"

দুর্গা বলিল "সে কি ? এই বসন্ত গায়ে অত দূরে তোমার ওখানে গেল কি করে ? আমার বাড়ীই ত কাছে. এখানে না এসে অত দূরে কেন গেল ?"

পরেশ বলিল "কাকা, আমার সংবাদ নেবার জন্য জ্বর-গায়েই মেসে গিয়েছিল। যাবার সময়ও সে জানতে পারে নাই যে, তার বসন্ত হয়েছে। চারিদিকে বসন্ত হচ্চে, তাই আমাকে দেখ্‌তে গিয়েছিল।"

"তারপর, তোমরা কি করে জান্‌লে যে তার বসন্ত হয়েছে।"

"কাকা আমাদের মেসে গিয়েই একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ল; একটা কথাও বল্‌তে পারল্‌ না। আমরা গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা একেবারে আগুন। তখনই ডাক্তার ডেকে আনি। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বল্‌লেন যে, শরীরের ভিতর বসন্ত হয়েছে ; মোটেই বাহির হয় নাই। যাদের বসন্ত খুব বাহির হয়, তাদের নাকি কোন ভয় থাকে না, শীগ্‌গীর সেরে উঠে ; কিন্তু যাদের বাইরে প্রকাশ হয় না, তাদের অবস্থা খুব খারাপ।"

দুর্গা বলিল "তা হ'লে কি হবে পরেশ ?"

পরেশ বলিল "ভগবান যা করেন, তাই হবে। শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা দেখ্‌তে হবে, তারপর অদৃষ্টে যা থাকে। তুমি আর দেরী কোরো না মাসি, ঘর-দোর বন্ধ কর, আমি একখানা গাড়ী ডেকে আনি।"

দুর্গা বলিল "দেখ বাবা, টাকা-কড়ির জন্য ভেব না ; আমার যা কিছু আছে, সব হরি ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য দেব। তুমি যাও, গাড়ী নিয়ে এস ; আমি সব গুছিয়ে ফেল্‌ছি।"

পরেশ তখন গাড়ী আনিতে ছুটিল। এদিকে দুর্গা তাহার বাক্স খুলিয়া নগদ টাকা যাহা ছিল, সমস্ত বাহির করিল। তখন আর গণিয়া দেখিবার সময় ছিল না। তাহার মনে হইল, এই টাকাই যথেষ্ট নহে। সে তখন তাহার যে কয়খানি সোণার অলঙ্কার ছিল, তাহা বাহির করিয়া টাকা ও অলঙ্কারগুলি আঁচলে বাঁধিল। তাহার পর জিনিষপত্রগুলি কোন রকমে ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ফেলিয়া, সে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরের দ্বারের কাছে আসিল। তাহার বাড়ীর পার্শ্বে-ই আর একখানি খোলার বাড়ী ছিল। সে বাড়ীতে কতকগুলি উড়িয়া বাস করিত। সে সেই বাড়ীতে যাইয়া তাহার বিপদের কথা বলিল, এবং তাহারা যেন তাহার বাড়ীর দিকে একটু দৃষ্টি রাখে, এই অনুরোধ করিয়া বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

২১

বেলিয়াঘাটার যেখানটায় দুর্গার বাড়ী,তাহার নিকটে গাড়ীর আড্ডা নাই; পরেশকে সেই জন্য সেতু পার হইয়া যাইতে হইয়াছিল, বড় রাস্তায় কিছু দূর যাইয়া সে একখানি গাড়ী পাইল। গাড়োয়ান যে ভাড়া চহিল, তাহাই দিতে স্বীকার করিয়া পরেশ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। এদিকে তাহার আসিবার বিলম্ব দেখিয়া দুর্গা ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল।

একটু পরেই গাড়ী লইয়া পরেশ উপস্থিত হইল। দুর্গা তখন সদর-দ্বারে চাবী বন্ধ করিয়া গাড়ীতে উঠিল।

এতক্ষণ তাহার মনেই হয় নাই যে, ছেলেদের মেসে তাহার

যাওয়া উচিত কিনা; সে কথা ভাবিবারও অবকাশ পায় নাই। এখন গাড়ীতে বসিয়া সে পরেশকে বলিল "বাবা, তোমাদের বাসার ছেলেরা আমাকে দেখে বিরক্ত হবে না ত। তা, তাদের তুমি বুঝিয়ে বোলো যে, আমি ঠাকুরকে নিয়ে আস্‌বার জন্যই যাচ্ছি; সেখানে আমি থাক্‌ব না, আমার থাকাও উচিত নয়। যেমন করে হোক, তাকে আমার বাড়ীতে আন্‌তেই হবে। তোমাদের দশ জনের বাসা; তারা বসন্ত রোগীকে বাসায় স্থান দেবে কেন? আর আমাকেই বা সেখানে থাক্‌তে দেবে কেন? আমি গিয়েই যেমন করে হোক্‌, তাকে বাড়ীতে নিয়ে আস্‌ব।"

পরেশ বলিল, "নিয়ে আস্‌বার আর উপায় নেই মাসীমা! কাকা যে একেবারে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় কি নিয়ে আস্‌তে পারা যায়। তার দরকারও হবে না। তুমি যে ভয় করছ, সে কিছুই না। এই আজই ত আমাদের মেসের অনেক ছেলের বাড়ী যাবার কথা ছিল; আমিই ভাবছিলাম, আমি কোথায় যাব—আমার ত আর বাড়ী-ঘর নেই। সবাই প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় কাকা গিয়ে পড়ল। তারপর ডাক্তার এসে যখন বল্‌লেন যে, বসন্ত হয়েছে, তখন সব ছেলে বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, কাকাকে ফেলে কেউ দেশে যাবে না। ডাক্তারবাবু কত ভয় দেখালেন, কিন্তু কেউ তাতে ভয় পেলে না; সবাই মেসে থাক্‌বে, সবাই কাকার শুশ্রূষা করবে, যত টাকা খরচ হয় সবাই মিলে দেবে। কাকার জন্য সবাই প্রাণপণ করেছে।"

দুর্গা বলিল "বাবা পরেশ, এমন কথা ত মানুষের মুখে কখন শুনিনি; তারা মানুষ না দেবতা! পরের জন্য এত করতে

পারে, এমন লোক যে কলিকালে আছে, তা ত আমি জান্‌তাম না।"

পরেশ বলিল "তারপর শোন মাসীমা! তারা যখন এই সব ব্যবস্থা করল, তখন আমি তোমার কথা তাদের কাছে বল্‌লাম। আমারও মনে হয়েছিল তোমাকে মেসে থাকতে দিতে হয় ত তারা আপত্তি করবে। কিন্তু তোমার কথা শুনে তারা আপত্তি করা দূরে থাক্, তোমাকে শীগ্‌গির নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিল। তুমি তাদের দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে, তারা কেমন। আচ্ছা মাসী-মা, গা দিয়ে যদি বসন্ত না বের হয়, তা হলে কি সত্যসত্যই মানুষ বাঁচে না?"

দুর্গার মনে যাহাই বলুক, পরেশকে সাহস দিবার জন্য সে বলিল "বাঁচবে না কেন? কত জন বেঁচেছে। তোমার কোন ভয় নেই; হরি ঠাকুরকে আমরা বাঁচিয়ে তুলব। যার জন্য এত লোক প্রাণ দিতে চায়, তাকে কি প্রভু নিয়ে যেতে পারেন? হরিকে ডাক বাবা, তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন।"

পরেশ কাঁদিয়া ফেলিল "মাসী-মা, কাকা ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই। আমি যে তারই ভরসায় আছি। কাকার কিছু হ'লে আমার উপায় কি হবে?"

দুর্গা পরেশের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল "ছি বাবা, বিপদের সময় কি কাতর হতে আছে। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, দয়াল হরির উপর নির্ভর কর—তিনি এ বিপদে কুল দেবেন। তিনি ছাড়া কি কেউ রক্ষা করতে পারে?"

পরেশকে সান্ত্বনা দিবার জন্য দুর্গা মুখে এই কথা বলিল,

কিন্তু তাহার মনে সে কথা বলিতেছিল না; বসন্ত বাহির না হইলে যে মানুষ বাঁচে না, জীবনের কোন আশাই থাকে না, এ কথা সে বেশ বুঝিয়াছিল। কিন্তু সে যদি কাতর হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পরেশ যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে; তাই সে মুখে ঐ কথা বলিল; তার বুকের মধ্যে যে কি হইতেছিল, তাহা ভগবানই জানেন।

একটু পরেই গাড়ী আসিয়া মেসের সম্মুখে উপস্থিত হইল। গাড়ীর শব্দ পাইয়া দুই তিনটী ছেলে দৌড়িয়া নীচে নামিয়া আসিল। পরেশ গাড়ী হইতে নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "অমর, ভাই, কাকার জ্ঞান হয়েছে?"

অমর বলিল "না, এখনও জ্ঞান হয় নাই। আমরা অনেক চেষ্টা করে এক দাগ ওষুদ খাইয়েছি; একটু পরেই হরিশ কাকার জ্ঞান হবে। এখন তোমরা শীগ্‌গির উপরে এস।"

দুর্গাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া সকলে উপরে গেল। দুর্গা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই হরিশের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই কাঁদিয়া উঠিল "ঠাকুর, এ কি করিলে।"

মোহিত তখন ঔষধের নেকড়া ভিজাইয়া হরিশের গায়ে লাগাইতেছিল; সে বলিল, "আপনি এত কাতর হবেন না। ডাক্তার বাবু বলে গিয়েছেন, এই ওষুধটা বার-বার সর্ব্বাঙ্গে দিলেই বসন্ত ফুটে বেরুবে; তা হলে আর ভয় নেই।"

এই কথা শুনিয়া দুর্গা মোহিতের হাত হইতে নেকড়াখানি লইতে গেল; মোহিত বলিল "আমিই দিচ্ছি, আপনি স্থির হোন।"

দুর্গা বলিল "বসন্তের রোগী, তোমরা বাবা, এখানে এমন করে বোসো না। যা যা করতে হবে, আমাকে বলে দাও; আমি সব করছি। তোমরা অত নাড়াচাড়া কোরো না বাবা! এ বড় খারাপ রোগ।"

ছেলেরা কি সে কথা শোনে? তাহারা সকলেই হরিশের সেবা করিতে লাগিল।

[২২]

ডাক্তার বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। সেদিন অপরাহ্ন হইতে সমস্ত রাত্রি ঔষধ ব্যবহার করিয়া পরের দিন প্রাতঃকালে দেখা গেল সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত বাহির হইয়াছে। ডাক্তার বাবু পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর পুনরায় আসিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও তিনি কোন আশা দিতে পারেন নাই।

প্রাতঃকালেই একটী ছাত্র ডাক্তার বাবুকে সংবাদ দিল। তিনি তখনই মেসে আসিলেন এবং রোগীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন "এখন এঁর বাঁচবার সম্ভাবনা অনেকটা হইয়াছে। জ্ঞান হয় নাই, তার জন্য তোমরা ভয় কোরো না। চারি পাঁচ দিন বোধ হয় এই প্রকার অজ্ঞান অবস্থায় কাটবে। কিন্তু, তোমরা খুব সাবধানে থেকো। এ রোগের সেবা করতে যাওয়া নিরাপদ নয়, এ কথা কালও বলেছি, এখনও বল্‌ছি, খুব সাবধান।"

তাহার পর দুর্গাকে দেখিয়া বলিলেন "ইনিই ত সেবা করছেন, আর বেশী লোকের দরকার কি? তোমরা এক আধ জন বাহিরে থেকো, আর সবাই দেশে চলে যাও। যে রকম ব্যাপার দেখ্‌ছি, তাতে তোমাদের সহর ত্যাগ করাই উচিত।"

অমর বলিল "আমিও সে কথা সকলকে বলেছি; আমি আর পরেশ থাকি, আর সবাই দেশে যাক্; কিন্তু কেউ সে কথায় সম্মত হয় না। সকলেই বল্‌ছে হরিশ কাকাকে সুস্থ না করে আমরা মেস ছেড়ে ন'ড়বো না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "এই যদি তোমাদের সঙ্কল্প হয়, তা হ'লে, আমি আর কি বলব! কিন্তু, তোমরা খুব সাবধানে থেকো; রোগীর ঘরে সকলেরই আসবার দরকার নেই।" এই বলিয়া ডাক্তার বাবু রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ স্ত্রীলোকটি কে? রোগীর কোন আত্মীয়া কি?"

মোহিত তখন দুর্গার কথা সমস্ত ডাক্তার বাবুকে বলিল। ডাক্তার বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন "তোমাদের হরিশ কাকার সবই আশ্চর্য্য! লোকটা যাদু জানে না কি হে? তোমরা সবাই হরিশ কাকা বলিয়া একেবারে অস্থির। তারপর কি না, বাজারের একটা বেশ্যা,—সেও ওর জন্য প্রাণপণ করছে। এ রকম কথা শুনেই ছিলাম, কিন্তু কখন চোখে দেখি নাই।"

মোহিত বলিল "ওঁর হাতে যা কিছু টাকা ছিল, আর যা সব অলঙ্কার, সমস্ত এনে আমাদের হাতে দিয়েছেন; চিকিৎসার জন্য সে সব খরচ করতে বলেছেন। আমরা তা করব না, যা খরচপত্র হয়, আমরাই দেব।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "সে বেশ কথা। ওঁর যা কিছু, সব যদি খরচ হয়, আর রোগী যদি না বাঁচে, তা হলে বেচারীকে এই শেষ বয়সে যে ভিক্ষা করে খেতে হবে। তা দেখ, চিকিৎসারই বা বেশী খরচ কি। আমি একটী পয়সাও ভিজিট

চাই না। আর তোমরা এঁর জন্য এত করছ, আমাকেও কিছু করবার সুযোগ দাও। আমি চিঠি লিখে দিয়ে যাচ্ছি; অতুল বাবুর ডাক্তারখানায় আমার হিসাব আছে। সেখান থেকেই সব ঔষধ এনো; তার দামটা আমার হিসাবে লিখে রাখ্‌বে।"

অমর বলিল, "আপনি যে রোজ এসে এমন করে দেখ্‌ছেন, এতেই আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। সে ঋণ আর বাড়াতে চান কেন? ওষুদের দাম আমরাই দেব।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "না হে না, তা হবে না; তোমাদের হরিশ কাকার জন্য আমাকেও কিছু করতে দেও।" এই বলিয়া তিনি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন এবং অতুল বাবুর নামে একখানা চিঠি লিখে দিলেন।

যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "আমাকে আর তোমাদের ডাক্‌তে যেতে হবে না, আমি প্রত্যহ দুবার তিনবার আস্‌ব। তবে যদি কিছু খারাপ দেখ, তখনই আমাকে সংবাদ দিও।"

একটী ছেলে বলিল "বসন্ত চিকিৎসায় দিশী কবিরাজ ডেকে আন্‌বার কি দরকার হবে?" ডাক্তার বাবু বলিলেন "না না, সে সব কাজ নেই। দিশী চিকিৎসা যে মন্দ, তা আমি বল্‌ছি না; কিন্তু আমার মনে হয়, আমরাও বসন্তের চিকিৎসা জানি, বিশেষ এ সম্বন্ধে আমার বেশী অভিজ্ঞতা আছে, তা বোধ হয় তোমরা শুনেছ।"

মোহিত বলিল "আমরা সেই জন্যই ত আপনাকে ডেকে এনেছি। আপনিই চিকিৎসা করুন। আপনার মত দেবতার

চিকিৎসায় যদি হরিশ কাকার প্রাণ না বাঁচে, আমাদের কোন আক্ষেপ থাকবে না।"

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে মোহিত বলিল "বামুন ঠাকুরের যে দেখা নেই, এখন কি হয় বল ত। ঝি বল্‌ছিল, কাল রাত্রেই ঠাকুর নাকি তাকে বলেছিল যে সে আর আস্‌ছে না। সে নিশ্চয়ই পালিয়েছে।"

এমন সময়ে বিন্দু ঝি সেখানে আসিয়া বলিল "ম্যানেজার বাবু, বামুনটা নিশ্চয়ই পালিয়েছে। কাল তার কথা শুনেই আমি সে কথা বুঝতে পেরেছিলাম। সে পালাতে পারে, আমি ত আর আপনাদের ছেড়ে পালাতে পারিনে। মায়ের কৃপা হয়েছে, তাতে ডরাতে নেই। এখন আর একটা বামুন খুঁজতে যেতে হয় ত। তা কেউ আস্‌তে চাইবে কি না তাই ভাবছি। ও-রোগের নাম শুন্‌লেই বামুনগুলো ভয় পায়—আমার কিন্তু কোন ভয় করে না। আর ভয় করলেই বা কি, তা বলে কি এমন অবস্থায় ফেলে যেতে পারি। বড় ভালমানুষ গো! বাসায় ঢুকেই আগে ডাক্‌ত 'ও মা বিন্দু!' কথা শুনেই প্রাণ জুড়িয়ে যেত। তা আপনাদের কাছে যখন এসে পড়েছে, তখন ওর আর ভয় নেই। যাক্—যাই দেখি, একটা বামুন খুজে পাই কি না দেখি। হ্যাঁ ম্যানেজার বাবু, আমি একটা কথা বলি, আপনারা সবাই ঘরে চলে যান না কেন? দুর্গা দিদি যখন এসেছে, আর আমিও আছি, আমরাই সব করব। রোগ ত ভাল নয়, বড় ছোঁয়াচে। মা না করুন, আর যদি কারু হয়, তা হলে সব দিক কে ঠেকাবে বলুন ত! না বাবু, আপনারা

সবাই ঘরে চলে যান। নিতান্ত থাকতে হয় পরেশ বাবু থাকুন, তাঁর যাওয়াটা ভাল দেখায় না।"

মোহিত বলিল "পরেশের ভাল দেখায় না, আর আমাদের ভাল দেখায়, এই বুঝি তোমার বিবেচনা ঝি! হরিশ কাকা আমাদের সকলেরই কাকা!"

বিন্দু বলিল "সে কথা ত বুঝি বাবু! কিন্তু আপনার প্রাণের বড় ত কিছু নেই, তাই বল্‌ছি।"

মোহিত বলিল, "তবে তুমি পালালে না কেন?"

বিন্দু বলিল "ঐ শোন কথা,—আপনারা আর আমি! আপনারা বড়মানুষের ছেলে,আপনাদের দশজন আছেন; আর আমার কি? আমি কপাল-দোষে, না হয় বুদ্ধির দোষে এখন সব হারিয়ে দাসীগিরি করছি। আমার বাঁচলেই বা কি, আর মরলেই বা কি? মরণই আমাদের ভাল। আমাদের সঙ্গে আপনাদের তুলনা। তা, সে কথা পরে হবে; এখন যাই দেখি, বামুন কোথায় পাই। আমায় সেই হেথায় সেথায় ঘুরতে হবে, তবে যদি বামুন মেলে। এদিকে যে বেলা হয়ে যাচ্ছে। বাজারের কি হবে? দোকানের জিনিস ত সব এনে রেখেছি।"

মোহিত বলিল "তুমি দেখ বামুন পাও কি না, আমরাই কেউ গিয়ে মুটে করে বাজার নিয়ে আসিগে।"

"সেই ভাল" বলিয়া ঝি বামুন-ঠাকুরের খোজে বাহির হইল; পথ হইতেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "দেখুন মেনেজার বাবু, মাছ কি পেঁয়াজ, ও সব বাড়ীতে আন্‌বেন না। মায়ের কৃপা হয়েছে, ওসব খেতে নাই। সেই কথা বলতে আবার ছুটে এলাম।"

মোহিত হাসিয়া বলিল "সে জ্ঞান আমার আছে ঝি, তুমি এখন যাও।"

"কি জানি বাবু, আপনারা ওসব মানেন কি না, তাই মনে করিয়ে দিতে এলাম।" বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

[২৩]

তিন দিন পরে হরিশের চৈতন্যোদয় হইল, কিন্তু তাহার কথা বলিবার বা চক্ষু চাহিবার শক্তি ছিল না; তাহার যে জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছে, তাহা তাহার অস্পষ্ট কাতরোক্তিতে বুঝিতে পারা গেল!

মেসের ছাত্রেরা ও দুর্গা অবিশ্রান্ত হরিশের তত্ত্বাবধান করিতেছে; দুর্গা নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে রোগীর পার্শ্ব ত্যাগ করিত না; কিসে সে একটু স্বস্তি বোধ করিবে, কিসে তাহার যন্ত্রণার লাঘব হইবে, দুর্গা অবিশ্রান্ত সেই চিন্তাতেই নিবিষ্ট। তাহার সেবাশুশ্রূষা দেখিয়া ছাত্রেরা, এবং ডাক্তারবাবু অবাক্ হইয়া যাইতেন। ডাক্তারবাবু ত একদিন আবেগভরে বলিয়াই ফেলিলেন "দেখ, হরিশকাকার যদি স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও এমন করিয়া সেবা করিতেন কি না সন্দেহ। আমি আমার অভিজ্ঞতা হতেই একথা বলছি। আর এমন শুশ্রূষা দুই চারজন experienced nurse ছাড়া আর কেহ করতে পারে না, একথা আমি খুব বলতে পারি। এর থেকে তোমরা একটা শিক্ষা এই পেতে পার যে, উপর-উপর দেখে কারও সম্বন্ধে বিচার করতে গেলে অনেক সময় ঠকে যেতে হয়। এই ধর না, এই দুর্গা। এ ত প্রলোভনে পড়ে

বা অন্য যে জন্যই হোক, পাপের পথে এসেছিল। তারপর যা করেছে না করেছে, তা আর বল্‌তে হবে না। কিন্তু এখন দেখ দেখি, ঐ পতিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে যে সেবার ভাব এতকাল গোপনে ছিল, আজ কেমন তা ফুটে উঠেছে। এখন ওকে দেখলে কি কেউ ঘৃণা করতে পারে, পাপী বলে অবজ্ঞা করতে পারে। এই সব দেখে আমার কি মনে হয় জান? আমার মনে হয়, যারা হঠাৎ প্রলোভন সংবরণ করতে না পেরে পাপের পথে যায়, তাদের কারও-কারও হয় ত প্রকৃত পক্ষেই ভয়ানক অনুশোচনা হয়, কিন্তু তখন ত আর তারা ফেরবার পথ দেখতে পায় না; একদিক ছাড়া আর দিক দেখতে পায় না। তখন অগত্যা তারা ঘৃণিত পথ অবলম্বন করে; ভাল ভাবে থাকবার চেষ্টা করেও অনেকে অকৃতকার্য্য হয়, বাধ্য হয়ে পাপের পথে যেতে হয়। কিন্তু ঐ যে প্রথমকার অনুশোচনা, তা কিন্তু তাদের একেবারে যায় না। তারাই শেষে এই দুর্গার মত হয়। এ সব খুব গুরুতর সামাজিক কথা; এ সব এখন তোমরা বুঝবে না। তবুও তোমাদের কাছে এ কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা কেহ দুর্গাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞার চোখে দৃষ্টি কোর না।”

অমর বলিল, “ওঁর ব্যবহার দেখে আমরা ত অবাক্ হয়ে গিয়েছি; ওঁকে দেবী বল্‌তে ইচ্ছা করে।”

ডাক্তারবাবু বলিলেন, “দেবী বল আর নাই বল, সাধারণ মানুষ থেকে উনি যে কোন-কোন বিষয়ে বড়, তাতে আর সন্দেহ নাই। আর এক কথা শোন; কাল একস্থানে বসন্তের সংক্রামক-

তার কথা উঠতে আমি তোমাদের কথা মনে ক বাসার হাওয়াটাই যারা নিঃস্বার্থভাবে রোগীর সেবা করে, সেবাতেই প্রা জন্য ছদ্মবেশ করে দেয়, তাদের শরীরে,হাজার ছোঁয়াচে রোগ হলেও,আ হয় না। একে আমি ভগবানের কৃপা বলি ; তাঁর আশীর্ব্বাদের ব বর্ম্মে আবৃত থাকে বলে এই সব সেবকের কিছু হয় না। সেখানে আমার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু, এই আমারই মত ডাক্তার, উপস্থিত ছিলেন। তিনি বল্‌লেন 'ওর কারণ কি জান ! নিঃস্বার্থ পরোপকারে ব্রতী হলে মনে এরূপ একটা উন্মাদনা উপস্থিত হয়, যাতে করে রোগ শরীরে প্রবেশ করতেই পারে না ;—এটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষিত সত্য।' কথাটা বুঝতে পেরেছ তোমরা। আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধু বল্‌তে চান যে,ভগবানের কৃপা, আশীর্ব্বাদ—ওসব কিছু না। শরীরে এমন একটা ভাব উপস্থিত হয়, যাতে রোগের আক্রমণই হতে পারে না ; অর্থাৎ এটা একটা প্রাকৃতিক সত্য। তোমরা এর কোন্ কথাটা মান্‌তে চাও, জানি না ; কিন্তু আমি ডাক্তার হয়েও একথা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি যে,এ ভগবানেরই কৃপা—এ পুণ্যের পুরস্কার! তাতে লোকে আমাকে যদি অবৈজ্ঞানিক বলে বলুক। দেখ, আজ তোমাদের সঙ্গে অনেক কথা বললাম, কারণ তোমরা উপযুক্ত পাত্র। এ কয়দিন তোমাদের হৃদয়ের যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমি তোমাদের কথা, যতদিন বাঁচব মনে রাখব। আর হরিশ কাকা যদি সুস্থ হয়ে উঠে, তাহলে ওকে আর আমি সে আড়তে ভাণ্ডারীগিরি করতে যেতে দেব না, আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব—কি বল ?"

পরেশ বলিল "কাকাকে ত আগে সুস্থ করে তুলুন, তারপর আর সব ব্যবস্থা করবেন, ওঁর ভার আপনাকেই নিতে হবে। আমরা ওঁকে আর সে আড়তে যেতে দিচ্ছিনে। এতদিন সেখানে কাজ ক'রেছেন, এত কালের বিশ্বাসী লোক, তার এমন কঠিন ব্যারামের কথা শুনে একটা লোক পাঠিয়েও তারা সংবাদ নিলে না ; আর আপনাদের সঙ্গে এই কয়দিনের সম্বন্ধ, আপনারা কাকার জন্য কত করেছেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "আমরা অর্থের খাতিরে করি।"

পরেশ বলিল "এখানে ত অর্থ লাভ হচ্ছে না, তবে করছেন কেন?"

ডাক্তার বাবু শুনিয়া বলিলেন "ওহে ছোকরা, অর্থলাভ হচ্ছে না, কিন্তু পরমার্থ লাভ হচ্ছে, তা জান?"

মোহিত বলিল "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আপনি আমাদের এত ভাল বাসতে আরম্ভ করেছেন। হরিশকাকার অসুখের উপলক্ষ্যেই ত আপনাকে আমরা পেলাম। এরই নাম out of evil cometh good. আপনি এত বড় লোক যে, কয়েকদিন আগে হ'লে আমরা আপনার কাছে এগুতেই সাহস পেতাম না, আর আজ আপনি একেবারে আমাদেরই একজন হয়ে পড়েছেন—এমন করে কথা ব'লছেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "শোন, মানুষের জীবনে এমন একটা দিন আসে, যে দিন যার-তার সঙ্গেই মন খুলে কথাবার্ত্তা বল্‌তে ইচ্ছা করে। কেন,তা জান? ভাল লোকের হাওয়া লেগে মানুষের উপরের পর্দ্দা সরে যায়, তখন মানুষ বালকের মত হয়। সেইটেই

হচ্ছে মানুষের চরম কামনা। তোমাদের এই বাসার হাওয়াটাই ভাল, তাই আমার মত ছদ্মবেশীকেও একটু সময়ের জন্য ছদ্মবেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হোল।"

মোহিত বলিল "এ হাওয়া কে বহিয়েছে জানেন? আমাদের হরিশ কাকা।"

অমর বলিল "আর ঐ দুর্গা ঠাকুরাণী।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "তোমার কথা খুব ঠিক। আমিও ঐ কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম।"

পরেশ এই সময় বলিয়া উঠিল "আচ্ছা ডাক্তার বাবু, কাকা কবে চোখ চাইতে পারবেন? তাঁর চোক দুটো যাবে না ত?"

পরেশের এই কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবুর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। অসম্ভব নয়। হরিশের চক্ষু দুইটা জন্মের মত যেতেও পারে। ডাক্তার বাবুর মনে হইল, পরেশের কাকা-অস্ত হৃদয়ে ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার ছায়া পড়িল না ত? এই ভাবিয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন "পাগল আর কি! চোখ যাবে কেন?"

পরেশ বলিল "যাবে কেন, তা জানিনে; কিন্তু হঠাৎই এ কথাটা আমার মনে এল।"

পরেশের কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবুর মুখ মলিন হইয়া গেল। তাঁর মনে হইল এটা ভবিষ্যদ্বাণী।

[২৪]

হঠাৎ পরেশের মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইয়াছিল, তাহাই ঠিক হইল। সাতদিন পরে বসন্তের ক্ষত যখন শুষ্ক হইতে

আরম্ভ করিল, হরিশের দুই একটী কথা বলিবার শক্তি হইল, তখন ডাক্তার বাবু একদিন হরিশকে চক্ষু চাহিবার অন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। হরিশ চক্ষু খুলিতে পারিল না; ডাক্তার বাবু অতি সন্তর্পণে প্রথমে একটী তারপর অপরটীর পাতা তুলিয়া দেখেন, দুইটী চক্ষু-তারকাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; আর কোনও উপায় নাই।

তিনি সে দিন কাহাকেও কিছু বলিলেন না; এ নিদারুণ কথা কেমন করিয়া তিনি উচ্চারণ করিবেন! তিনি ত এখন আর শুধু চিকিৎসক নহেন, তিনি হরিশের পরমাত্মীয় হইয়া পড়িয়াছেন; ছেলেরা যেমন হরিশকে কাকা বলিয়া ডাকে, তাহাদের দেখাদেখি তিনিও হরিশকাকাই বলেন। তিনি মনে করিলেন কথাটা এখন গোপন রাখাই ভাল, হরিশ নিজেই যেদিন বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ করিবে, সেই দিনই সকলের গোচর হইবে।

ডাক্তার বাবু চেষ্টা করিয়া হরিশের চক্ষু দুইটী একবার খুলিয়া পরীক্ষা করায় হরিশের চক্ষু নাড়িবার একটু সুবিধা হইয়াছিল। সেদিন আর চক্ষু চাহিবার চেষ্টা করে নাই, পরদিন একটু চেষ্টা করিতেই সে চক্ষুর পাতা খুলিতে পারিল। কিন্তু এ কি! সবই যে অন্ধকার।

সে তখন ক্ষীণস্বরে ডাকিল "দুর্গা, আমি যে কিছুই দেখ্‌তে পাইনে; সব যে অন্ধকার!"

দুর্গাই তখন হরিশের কাছে বসিয়া ছিল, আর কেহ ঘরের মধ্যে ছিল না। দুর্গা বলিল "অন্ধকার! সে কি? না না, ও কিছু না। আজ কতদিন চোখ খুল্‌তে পার নাই, তাই আজ

প্রথম যখন চাইছ, তখন সব অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। ও অন্ধকার থাক্‌বে না, আর দু-একবার চাইতে চাইতেই সব দেখ্‌তে পাবে।"

হরিশ বলিল "না দুর্গা, তা নয়। কাল ডাক্তার বাবু যখন আমার চোক একবার খোলেন,তখন সব অন্ধকার দেখেছিলাম। ডাক্তার বাবু এমন ভাবে আমার চোক ছেড়ে দিলেন যে,তাতেই আমি বুঝতে পারলাম, আমার চোক দুটোই গিয়েছে। আমি তখন সাহস করে ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। সত্যই দুর্গা, আমার দুটো চোকই গিয়াছে। এবার সব অন্ধকার দুর্গা, এবার সব আঁধার।" এই বলিয়াই হরিশ নীরব হইল।

পরেশ পাশের ঘরেই ছিল; সে হরিশের কথার শব্দ পাইয়াই রোগীর ঘরে আসিয়া বলিল "মাসীমা, কাকা কি বল্‌ছিল?"

দুর্গা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই হরিশ কাতর স্বরে বলিল "বাবা পরেশ, এজন্মে আর তোর মুখখানি দেখ্‌তে পাব না বাবা।"

পরেশ বলিল "সে কি? কি হয়েছে?"

দুর্গা বলিল, "ঠাকুর বল্‌ছে, ও চোক চেয়ে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছে না; সব অন্ধকার।"

হরিশ বলিল "সব অন্ধকার বাবা, আমার সব অন্ধকার!"

পরেশ বলিল "ও তুমি কি বল্‌ছ কাকা! অন্ধকার কি? অনেক দিন পরে চোক চেয়েছ, তারপর চোখের মধ্যেও যে বসন্ত বেরিয়েছিল,তা ত এখনও শুকিয়ে যায় নি, সেইজন্য দেখ্‌তে পারছ না; ভিতরটা শুকিয়ে গেলেই তখন দেখ্‌তে পাবে।"

হরিশ বলিল "না বাবা, তা নয়, সত্যসত্যই আমার দুটো

চোকই গিয়েছে। আমি এখন অন্ধ। তোদের মুখ দেখ্‌তে পাব না। গুরু, এ কি করলে!"

পরেশ তখন অন্য ঘর হইতে আর সকলকে ডাকিয়া আনিল; সকলেই ঐ কথা বলিল। শেষে অমর বলিল "অত গোলমালে কাজ কি? আমি ডাক্তার বাবুর কাছে যাই। তিনি এসে পরীক্ষা করে কি বলেন, তাই শোনা যাক্‌।"

অমর ও মোহিত তখনই ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন আট্‌টা। ডাক্তার বাবু রোগী দেখিবার জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় অমর ও মোহিত ডাক্তার বাবুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন "কি হে, তোমরা যে একেবারে দুইজন এসে হাজির। খবর ভাল ত? হরিশ কাকা আজ কেমন আছে?"

মোহিত বলিল "তারই জন্যই ত এসেছি। হরিশকাকা বল্‌ছে যে, সে চোখে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছে না, সব অন্ধকার।"

ডাক্তার বাবু একটু নীরব থাকিয়া, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "হরিশকাকা যা বলেছে, তাই ঠিক। তার দুটো চোখই গিয়েছে—একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাকে বাঁচালেম বটে, কিন্তু চোখ দুটো গিয়েছে।"

অমর ও মোহিত এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ, চোখ গিয়েছে? দুটো চোখই কি নষ্ট হয়েছে ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "দুটো চোখই একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

অমর বলিল "দৃষ্টিশক্তি ফিরাবার কি কোন উপায় নেই ?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "সে দিন আমি দেখে যতদূর বুঝেছি, তাতে দুই চোখেরই তারকা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। তবে আমি ত চক্ষু-চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ নই; মোটামুটি দেখ্‌তে জানি, তাই থেকেই বল্‌ছি। হরিশকাকা আর একটু সুস্থ হ'লে ভাল একজন চক্ষু-চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখা যাবে। তোমরা নিরাশ হোয়ো না। হরিশকাকার দৃষ্টি ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য যদি কোনও উপায় থাকে, তা আমি অবশ্যই করব; তোমরা এখনই ব্যস্ত হোয়ো না।"

অমর বলিল "তা হ'লে ডাক্তার বাবু আপনি একবার আমাদের বাসায় চলুন। হরিশকাকাকে সেই কথাই বল্‌বেন। তিনি বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েছেন। পরেশ ত একবারে কেঁদে ফেলেছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "দেখ, তোমরা কাতর হ'লেই হরিশকাকাও কাতর হবে। তোমরা যদি ব্যাকুল না হও, তা হ'লে কিছুতেই তাকে কাতর করতে পারবে না। তোমরা ছেলেমানুষ, তোমরা এখনও হরিশকাকাকে চিন্‌তে পার নাই। পৃথিবীর সহস্র বিপদেও তাকে কাতর করতে পারে না, এ আমি বেশ বুঝেছি। এ বয়সে আমি অনেক লোক দেখেছি, অনেক রোগীর চিকিৎসা করেছি, কিন্তু এমন লোক আমি দেখি নাই।"

অমর বলিল "সে যাই হোক ডাক্তার বাবু, আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতেই হচ্চে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন "চল, আমি ত প্রস্তুতই আছি।"

তাহার পর তিনজনেই ডাক্তার বাবুর গাড়ীতেই মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গাড়ী যখন মেসের দ্বারে আসিয়া লাগিল, তখন পরেশ তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া অমরকে বলিল "অমর তোমার বাবা এসেছেন, তিনি বললেন যে আজ সাত আট দিন তোমার কোন সংবাদ না পেয়ে তিনি বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলেন; তাই কোন সংবাদ না দিয়েই একেবারে এসে পড়েছেন।"

অমর বলিল "বাবা এখন কোথায় রয়েছেন?"

"তিনি হরিশকাকার কাছে ব'সে আছেন। হরিশকাকার সমস্ত কথা আমি তাঁকে বলেছি। আর তার জন্যই যে তুমি বাড়ী যেতে পার নাই, সে কথাও তাঁকে জানিয়েছি। সে কথা শুনে তোমার বাবার মুখ এমন প্রফুল্ল হয়েছিল যে, আমি তেমন প্রফুল্ল মুখ কখন দেখি নাই। এমন বাপ না হ'লে কি এমন ছেলে হয়?"

অমর বলিল "তোমাকে আর Compliment দিতে হবে না। এখন চল উপরে যাই।"

ডাক্তার বাবুকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে হরিশ কাকার ঘরে প্রবেশ করিলে, অমরের পিতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরেশ ডাক্তার বাবুকে বলিল "ডাক্তার বাবু, ইনি আমাদের অমরের পিতা হরিশ বাবু।"

হরিশ বাবু ডাক্তার বাবুর সহিত করমর্দ্দন করিতে উদ্যত হইলে, ডাক্তার বাবু বলিলেন "না, না, ও কি করেন।" বলিয়াই তিনি হরিশ বাবুকে প্রণাম করিলেন; বলিলেন "আমি আপনার চাইতে বয়সে ছোট। তার পর আপনার নাম আর আমাদের

হরিশকাকার নাম যে এক ; আপনি আমার কাকাবাবু হলেন যে।"

হরিশ বাবু ডাক্তার বাবুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "নামই মিলেছে বটে ; কিন্তু ওঁর কথা যা শুনলাম, তাতে ওঁতে আমাতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটু আগেই ওঁকে বলছিলাম, যে নামে মিলে গিয়েছে বলে মিত্র সম্ভাষণ করতে হয়, কিন্তু উনি যে দেবতা আর আমি যে অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য লোক। তবে শ্রীরামচন্দ্রও গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলেছিলেন, এই যা ভরসা।"

ডাক্তার বাবু হাসিতে হাসিতে অমরকে বলিলেন "ওহে অমর, তোমার বাবাকে প্রণাম করলে না?"

মোহিত বলিল "আমরা আর প্রণাম করবার সুবিধা পেলাম কৈ? আপনাদের প্রণামই যে শেষ হয় না।" বলিয়া অমর ও মোহিত হরিশ বাবুকে প্রণাম করিল ; মোহিত অমরেরই দূর-সম্পর্কে মাতুলপুত্র।

হরিশবাবু সহাস্য মুখে বলিলেন "অমরের কোন পত্র না পেয়ে আমি ভারি ভাবনায় পড়েছিলাম। এখানে ভয়ানক বসন্ত হচ্চে খবর পেয়ে অমরকে বারবার বাড়ী যেতে লিখেছিলাম ; তা ছেলে এমনি যে বাড়ীও গেল না, কোন সংবাদও লিখ্‌লে না। বাড়ীতে সকলেই মহা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কাজেই আমাকে ছুটে আস্‌তে হোলো। এসে যা শুনলাম, তাতে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছি। ডাক্তার বাবু! আমার আজ মনে হচ্ছে যে, আমার জন্ম সফল হয়েছে। আমার ছেলে যে এমন করে নিজের প্রাণের মায়া না করে, আমার এই মিত্রের সেবা করছে, এর বাড়া•

আনন্দের কথা আর নাই। কিন্তু এত আনন্দেও ডাক্তার বাবু, আমার প্রাণে বড় কষ্ট হচ্চে। মিত্র বল্‌ছিলেন, তাঁর না কি দুটী চক্ষুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি বল্‌ছিলাম, মিথ্যা কথা। আপনি ঠিক করে বলুন ত ওঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে কি?"

হরিশ বলিল "ডাক্তার বাবু, আমার চোখ দুটো কি একবার —একটী বারের জন্য খুলে দিতে পারেন না? কেবল একটী বার আমি চোখ চেয়ে দেখ্‌তে চাই, আমার দয়াল প্রভু আজ যাঁকে আমার পাশে এনে বসিয়ে দিলেন, তাঁর রূপ আমার প্রভুর রূপের মত কি না। আর দেখ্‌তে চাই, আপনি ডাক্তার বাবু, মানুষ না দেবতা। তারপর জন্মের মত আমার চোখদুটো বন্ধ করে দেবেন; আমি একটুও কাতর হব না। আমার বাছাদের আমি দেখেছি, এখনও এই অন্ধকারে তাদের মুখ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি; তাদের ত আমি হারাই নেই ডাক্তার বাবু; কিন্তু যিনি আজ আমার মত অধমকে মিতে ব'লে ডাক্‌লেন, সেই দয়াল মিতেকে যে আমি দেখতে পাচ্ছিনে, আপনাকে যে আমি দেখতে পাচ্ছিনে, এই আমার বড় কষ্ট।"

ডাক্তার বাবুর চক্ষু সজল হইল—তিনি অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন "হরিশকাকা, আপনি ত আপনার দয়াল প্রভুর রূপ দেখ্‌তে পাচ্চেন, তা হ'লেই হোলো। মানুষের মুখ ত এত দিন দেখেছেন, মানুষের মায়ায় ত এত দিন বদ্ধ ছিলেন। প্রভু যে তা চান না; তাঁর ইচ্ছা তাঁর পরম ভক্ত দিনরাত তাঁরই রূপসাগরে ডুবে থাকেন; সেই জন্যই তিনি আপনার বাহিরের চোখ দুটো বন্ধ করে দিতে চান, এ তাঁরই খেলা হরিশকাকা।"

হরিশ বাবু আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না ; তিনি গাত্রো খান করিয়া ডাক্তার বাবুকে একেবারে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "ডাক্তার বাবু, তুমি কি মানুষ, না দেবতা! এমন কথা ত আমি মানুষের মুখে কখন শুনিনি—এ যে দেববাণী! এই দেবদর্শন যে বহু পুণ্যফলে হয়।"

ডাক্তারবাবু হরিশবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন "আপনি অমন কথা বলবেন না। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, এই ছেলেদের অসাধারণ সেবা দেখে, আর হরিশ কাকার মুখের কথা শুনে, তাঁর আশ্চর্য্য জীবনের কথা শুনে আমি পবিত্র হয়ে গিয়েছি। এই ছেলেগুলো আর এই হরিশ কাকা আমার চোখ খুলে দিয়েছে।"

হরিশ বলিল "আপনারা সবাই ভুলে যাচ্ছেন। এই সোণার চাঁদ ছেলেদের পেয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছিল! তারপর প্রভু আপনাদের দুজনকে মিলিয়ে দিলেন। আপনি ঠিক বলেছেন ডাক্তারবাবু, এই সবই আমার দয়াল ঠাকুরের খেলা। মোহিত, বাবা, তুমি কা'ল আমার শিয়রে বসে যে গান করছিলে, সেই গানটা আবার শোনাও বাপ! অন্ধের অন্ধকার আর থাক্‌বে না।"

মোহিত বলিল "হরিশকাকা, আমি ত গাইতে জানিনে। কা'ল তুমি বড় কাতর হয়ে পড়েছিলে, তাই তখন আমি পাগলের মত চেঁচিয়েছিলাম।"

হরিশ বলিল "তেমনিই ক'রে আর একবার চেঁচাও বাপ্।"

হরিশবাবু বলিলেন "নিতে শুন্‌তে চাচ্ছেন, গাও ; তাতে লজ্জা কি?" ছেলেরাও সকলে বলিল "গাও না মোহিত!"

মোহিত তখন আর কি করে। সে গাহিতে লাগিল—

"এ কি করুণা তোমার, ওহে করুণা-নিধান !
অধম সন্তানে প্রভু, এত তোমার করুণা কেন ?
আমি সতত তোমারে ছেড়ে
থাকিতে চাই দূরে.
তবু তুমি প্রেমভরে কর মোরে আলিঙ্গন।"

মোহিতের এই গান যেন সকলের হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিল। গান শেষ হইলে হরিশবাবু বলিলেন 'মিতে, তুমি এখানে চাঁদের হাট বসিয়েছ। এ সবই তোমার খেলা মিতে !"

[২৫]

সেইদিন সন্ধ্যার পর মেসের একটী ঘরে সকলে মিলিত হইলেন ; ডাক্তার বাবুকেও ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। হরিশ বাবু বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, একটা পরামর্শের জন্য আপনাকে ডেকে এনে কষ্ট দিলাম। মিতের যে দুইটী চোখই নষ্ট হইয়াছে, তাতে আর সন্দেহ নাই। এখন কি করা যায় ! আপনি ও-বেলা চলে গেলে আমি মিতের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি সবই বুঝ্‌তে পেরেছেন। দেখলাম, তাঁর আর কোন ভাবনা নাই, শুধু ভাবছেন পরেশের কথা। তিনি বললেন যে, আড়তে তাঁর চার পাঁচশ টাকা জমা আছে ; দেশে বিঘে কুড়ি জমি আছে, আর একটা বাড়ী আছে ; তিনি ঐ টাকাগুলি, আর বাড়ী ও জমি বেচে যে টাকা হবে, সে সমস্তই পরেশের লেখাপড়া শিখিবার জন্য দিতে চান। মেয়েটী আছে, তার জন্য ভাবনা নেই। সে ভাল ঘরে পড়েছে ; আর মিতে তাকে যা দিয়েছেন, তাতে তার কখন কষ্ট

হবে না। তাঁর নিজের চলবে কি করে, দুর্গারই বা কি ব্যবস্থা হবে ; সে কথার উত্তরে বলিলেন যে, সেজন্য তাঁর একটুও ভাবনা নেই। যিনি তাঁর বাইরের চোখ দুটো বন্ধ করে দিয়ে, ভিতরে আলো করে দিয়েছেন, সে ভার তাঁরই উপর—তিনি তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দুর্গাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বৃন্দাবন কি নবদ্বীপে যাবেন ; তার দয়াল প্রভু সেখানে তাঁদের জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন, “হরিশ কাকা যে ব্যবস্থা করতে চান, তাতে আমার একটু আপত্তি আছে। আমি অতি সামান্য লোক, আমার সাধ্যও সামান্য। আপনাদের যদি মত হয়, তা হলে পরেশের সম্পূর্ণ ভার আমি নিতে চাই। তার লেখাপড়া শিখবার জন্য যা করতে হয়, আমি করব। তবে হরিশকাকা তাকে যে আদরে প্রতিপালন করছিলেন, তা দেবার সাধ্য আমার কেন, কারও নেই। হরিশকাকার টাকাকড়ি ও জমিজমা বাড়ী সব তার মেয়েকেই দেওয়া আমার অভিপ্রায়। আপনি এতে কি বলেন ?”

হরিশ বাবু বলিলেন, “আমি এ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সম্মতি দিচ্চি। শুনেছি দুর্গার কিছু টাকাকড়ি ও গহনা-পত্র আছে। সে তার সমস্ত কোন সৎকার্য্যে দান করে, নিঃসম্বলে মিত্রের সঙ্গে তীর্থ-স্থানে যেতে চায়। সেখানে কি করে চলবে জিজ্ঞাসা করায় দুর্গা বলিল যে কথা সে জানে না, ভাবেও না —সে ভাবনা ঠাকুরের—দীনবন্ধুর।”

পরেশ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। হরিশ বাবুর কথা শেষ

হইলে সে বলিল, "আমি আর পড়াশুনা করব না, কাকার সঙ্গে আমিও যাব। সেখানে কাযকর্ম্ম পাই, ভালই ; নিতান্ত কিছু না জোটে, ভিক্ষা করে কাকা আর মাসীর ভরণপোষণ করব, আর তাঁদের সেবা করব। কাকার এই অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না—আমার কাকা যে অন্ধ।" পরেশ আর কথা বলিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "সে হতে পারে না পরেশ। তোমাকে লেখাপড়া শিখতেই হচ্ছে ;—তোমার কাকাকে ভবিষ্যতে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখবার জন্যই তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। হরিশ কাকার সেবার ব্যবস্থা আমরা করব, সে জন্য তুমি ভেবো না।"

হরিশবাবু বলিলেন, "আমারও একটা প্রস্তাব আছে। আমি অমরের পিতা, এই জন্যই প্রস্তাব করতে সাহস কচ্ছি। পরেশ যেমন মিতের ছেলের মত, অমরও তেমনিই। মিতের সম্বন্ধে অমরেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। আমি অমরের হয়েই বলছি, মিতে আর দুর্গা বৃন্দাবনেই থাকুন, আর নবদ্বীপেই থাকুন, তাঁরা যতদিন বাঁচবেন, তাঁদের ভার অমরকে নিতে হবে। এই আমার প্রার্থনা।"

অমর বলিল, "হরিশ কাকাকে বৃন্দাবনে যেতে দেওয়া হবে না। এখানে থাকলেই ভাল হয়। তিনি নিতান্তই তীর্থ-স্থানে যেতে চান, তাহলে তাকে নবদ্বীপ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন আমরা তা হ'লে যখন তখনই সেখাকে গিয়ে কাকাকে দেখে আস্‌তে পারব।" ছেলেরা সকলেই সেই কথায় সায় দিল। তখন ডাক্তারবাবু বলিলেন, "চলুন সকলে হরিশকাকার

কাছে যাই। আমরা যা স্থির করলাম, তাঁকে বলিগে। তিনি তাতে কি বলেন শোনা দরকার।" তখন সকলে মিলিয়া হরিশ ও দুর্গা যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে গেলেন। তাঁহাদের আগমন জানিতে পারিয়া হরিশ কাকা বলিল, "কে?" ডাক্তার বাবু উত্তর দিলেন "হরিশকাকা, আমরাই তোমার কাছে এসেছি।" হরিশ বলিল, "ডাক্তার বাবু, কখন এলেন?" ডাক্তারবাবু বলিলেন, "অনেকক্ষণ এসেছি; পাশের ঘরে বসে গল্প করছিলাম। এখন কাকা, তোমার কাছে একটা দরকারে এলাম।" হরিশ বলিল, "আমার কাছে দরকার! আমার দরকার ফুরিয়ে গেছে ডাক্তারবাবু! এখন প্রভু টেনে নিলেই হয়।" হরিশবাবু বলিলেন "দয়াল প্রভু নিতে চাইলেই আমরা যেতে দিই কই, মিতে!" হরিশ হাসিয়া বলিল, "এমনই আপনাদের দয়া। প্রভু আমার কত খেলাই দেখালেন। চোখ দিয়ে এতদিন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালেন, আবার এখন দুইটা চোখ কেড়ে নিয়ে দশটা চোখের বেড়া দিয়ে আমাকে আগলে বসলেন। মিতে, আমি প্রভুর খেলা দেখে অবাক হয়ে যাই। কোথাকার কে আমি, কত পাপী, কত নীচ; আমার জন্য তিনি এত দয়া গুছিয়ে রেখেছেন। এই যে অন্ধ করে দিলেন, এই কি তাঁর কম দয়া; একেবারে বাইরের দেখা ঘুচিয়ে দিলেন। এখন শুধু বলেন দেখ্, দেখ্, আমাকে দেখ্!" ডাক্তারবাবু বলিলেন, "হরিশ কাকা, আমরা একটা ব্যবস্থার কথা তোমাকে বলতে এসেছি।" হরিশ বলিল "ডাক্তার বাবু, আমার ব্যবস্থা ত প্রভু করে দিয়েছেন, তিনি ত কারো অপেক্ষা রাখেন নাই।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "সেই ব্যবস্থার কথাই শোনাবার ভার প্রভু আমাদের উপর দিয়েছেন।—আমরা তাঁরই হয়ে আজ কথা বল্‌ছি।" হরিশ হৃষ্টচিত্তে বলিল, "বেশ বেশ, আমার ঠাকুরের কথা বলুন, ভাল করে বলুন।" ডাক্তার বলিলেন, "ঠাকুর আদেশ করেছেন যে, পরেশ এখন থেকে আমার কাছে থাক্‌বে, তিনিই আমার হাতে দিয়ে তার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আর তাঁরই আদেশ যে, তোমার যা টাকাকড়ি, জমিজমা, বাড়ীঘর আছে, তা সব তোমার মেয়েকে দিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও আদেশ করেছেন যে, তোমাদের দুইজনের জীবনান্ত পর্য্যন্ত ভরণপোষণের ভার এই অমরের পিতা আপনার মিত্র হরিশ বাবুকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের কথা নয় হরিশকাকা, এ সব প্রভুর আদেশ। এ আদেশ তোমাকে পালন করতেই হবে।"

হরিশ এই সকল কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল; বেশ বুঝিতে পারা গেল, সে যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে; কি বলিয়া তাহার মনের আবেগ প্রকাশ করিবে, খুঁজিয়া পাইতেছে না। শেষে ধীরে ধীরে বলিল, "আমার দয়ার প্রভু, এত তোমার করুণা! এতদিন তুচ্ছ চাল-ডালের, টাকাপয়সার ভাণ্ডারী-গিরিতে ভুলিয়ে রেখেছিলে কেন দয়াল? আজ আমি সত্যসত্যই ভাণ্ডারী! আজ আমার প্রভু গোলোকের ভাণ্ডারে আমাকে বাহাল করে দিলেন। এত করুণা! এত দয়া এ ভাণ্ডারে জমা ছিল, তা ত আমি জানতাম না। বাবা পরেশ, তুই আমাকে হাত ধরে এনে যে ভাণ্ডারে বসিয়ে দিলি, এর ত

তুলনা নেই। আয় বাবা, তোকে একবার কোলে করি। তুই আমার দয়াল, বাবা, তুই আমার দয়াল! নইলে এত সাধু, এত ভক্ত, এত হরি-দাস তুই পেলি কোথা? মিত্র, তোমাকে বাইরের চোখ দিয়ে দেখতে পেলাম না; ডাক্তার বাবু, তোমাকেও কোন্ দিন দেখা হ'ল না; কিন্তু আমি যে তোমাদের মূর্তি বুকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তোমরা যে সবাই আমার দয়াল! তোমরা যে সবাই আমার নারায়ণ! ওরে আমার ছেলেরা, তোদের দেখে বুঝেছিলাম, তোরা সেই ব্রজের রাখাল-বালক! আয় তোরা, তোদের হরিশ কাকা আজ স্বর্গে যাচ্ছে! আজ তার মুক্তি! দুর্গা, আর দেখ্‌ছ কি দয়াল প্রভু আজ গোলোক থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন; তাঁর ভাণ্ডারের ভাণ্ডারীগিরি আজ আমি পেয়েছি দুর্গা, পেয়েছি! আজ আমি সত্য-সত্যই হরিশ ভাণ্ডারী!"

হঠাৎ হরিশের কথা বন্ধ হইয়া গেল; শরীর স্থির হইল, অঙ্গ অবশ হইল। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি হরিশের শয্যা-পাশে যাইয়া হাতখানি তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, নাড়ীর গতি লোপ হইয়াছে, বক্ষে স্পন্দন নাই। ডাক্তার বাবু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "হরিশকাকা, আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে!"

হরিশ বাবু, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "যাও মিত্র, গোলোকের ভাণ্ডার তোমার জন্য খোলা রয়েছে। তুমি আমাদের নও, তুমি সেখানকার——

হরিশ ভাণ্ডারী।

সমাপ্ত।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা।

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা এইরূপ সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী', ও 'পল্লী-সমাজ' ইত্যাদির এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে ষষ্ঠ সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, অপ্রকাশিত গুলির জন্য নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; যখন যেখান প্রকাশিত হইবে ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৵৹ মূল্যে প্রেরিত হইবে। এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

১। **অভাগী** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
২। **ধর্ম্মপাল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। **পল্লীসমাজ** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। **কাঞ্চনমালা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৫। **বিবাহবিপ্লব**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল।
৬। **চিত্রালি**—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। **দুর্ব্বাদল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। **শাশ্বতভিক্ষারী**—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। **বড়বাড়ী** (চতুর্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। **অরক্ষণীয়া** (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১। **ময়ূখ** (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ
১২। **সত্য ও মিথ্যা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। **রূপের বালাই**—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়। (২য় সং-যন্ত্রস্থ)।
১৪। **সোণার পদ্ম** (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। **লাইকা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। **আলেয়া** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। **বেগম সমরু** (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। **নকল পাঞ্জাবী** (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। **বিল্বদল**—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২০। **হালদার বাড়ী**—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (২য়সং-যন্ত্রস্থ)
২১। **মধুপর্ক**—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। **লীলার স্বপ্ন**—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩। **সুখের ঘর** (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।
২৪। **মধুমল্লী**—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২৫। **রসির ডায়েরী**—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। **ফুলের তোড়া**—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২৭। **ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। **সীমন্তিনী**—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। **নব্য-বিজ্ঞান**—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ।
৩০। **নববর্ষের স্বপ্ন**—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। **নীলমাণিক**—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।
৩২। **হিসাব নিকাশ**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।
৩৩। **মায়ের প্রসাদ**—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। **ইংরাজী কাব্যকথা**—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।
৩৫। **জলছবি**—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। **শয়তানের দান**—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। **ব্রাহ্মণ পরিবার**—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
৩৮। **পথে-বিপথে**—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই।

৩৯। **হরিশ ভাণ্ডারী** (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

৪০। **কোন্ পথে**—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।

৪১। **পরিণাম**—শ্রীগুরুদাস সরকার এম, এ।

৪২। **পল্লীরাণী**—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৪৩। **ভবানী**—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

৪৪। **অমিয় উৎস**—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪৫। **অপরিচিতা**—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

৪৬। **প্রত্যাবর্ত্তন**—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

[illegible] **দ্বিতীয় পক্ষ**—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল।

৪৮। **ছবি** (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪৯। **মনোরমা**—শ্রীসরসীবালা বসু।

৫০। **সুরেশের শিক্ষা**—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ।

৫১। **নাচ্‌ওয়ালী**—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ।

৫২। **প্রেমের কথা**—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

৫৩। **গৃহহারা**—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৪। **দেওয়ানজী**—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৫৫। **কাঙ্গালের ঠাকুর**—(দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

৫৬। **গৃহদেবী**—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

৫৭। **হৈমবতী**—শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

৫৮। **বোঝা-পড়া**—শ্রীনরেন্দ্র দেব।

৫৯। **বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

৬০। **হারান ধন**—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।

৬১। **গৃহ-কল্যাণী**—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

৬২। **সুরের হাওয়া**—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস্‌-সি।